চাঁদমামা
নভেম্বর ১৯৭২
৭০
P

Photo by: P. M. VARAPRASADA RAO

রঙেভরা...মনেরমত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা!
PARLE POPPINS FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাম্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PP|ben

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

পূজা সংখ্যার ভিড়েও পাঠকরা চাঁদমামা পড়েছে। মতামত পাঠিয়েছে। এতে আমরা দারুণ খুশী। এবারের ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

যক্ষ পর্বত গল্পটি এবারেও রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হবে। একদিনের রাজা এ সংখ্যাতেও শেষ হল না। কারণ পড়লেই বোঝা যাবে। এ মাসের সংখ্যাতে আরও মজার মজার গল্প আছে: যেমন রাজা তেমন প্রজা, ধোকাবাজ, শাসক, পতিব্রতা, বীণার জন্য ঘি, পরামর্শ, যার ভাগ্যে যা, চীনা পণ্ডিত, কলিযুগ, নারীর অনুগত, অমৃত, তরকারির স্বাদ প্রভৃতি। এবারেও মহাভারত চলছে আর শিব-পুরাণ চলছে চলবে।

খণ্ড ১ নভেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা ৫

শরদি ন বর্ষতি গর্জতি,
বর্ষতি বর্ষাসু নিস্স্বনো মেঘঃ
নী চোবদতি ন কুরুতে,
সুজনো ন বদতি করোত্যেব । ॥১॥

[শরৎ ঋতুতে মেঘ গর্জন হয় কিন্তু বর্ষণ হয় না। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে মেঘ গর্জন ছাড়াই বর্ষণ হয়। নীচ ব্যক্তি শুধু কথা বলে, কাজ করে না কিন্তু সজ্জন ব্যক্তি বেশি কথা বলে না, কাজ করে যায়।]

অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে, প্রাভাতে মেঘডম্বরে,
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভো লঘুক্রিয়া । ॥২॥

[ছাগলের গুঁতোগুঁতিতে, ঋষিদের শ্রাদ্ধকর্মে, সকালের মেঘে অথবা দাম্পত্য কলহে বাইরের গর্জনই বেশি, কাজ কিছু নেই।]

নশ্যাত্য নায়কম্‌কার্যম্‌
তথৈব শিশু নায়কম্‌
স্ত্রী নায়কম্‌, তথোন্মত্ত
নায়কম্‌ বহু নায়কম্‌ । ॥৩॥

[মালিকের তত্ত্বাবধান ছাড়া যে কাজ হয় এবং ছোট বাচ্চারা, মেয়েরা, পাগল আর বহু লোকের নেতৃত্বে যে কাজ হয় ; সেই কাজ খারাপ হয়।]

ক্রিয়া, অক্রিয়া, দুষ্ক্রিয়া
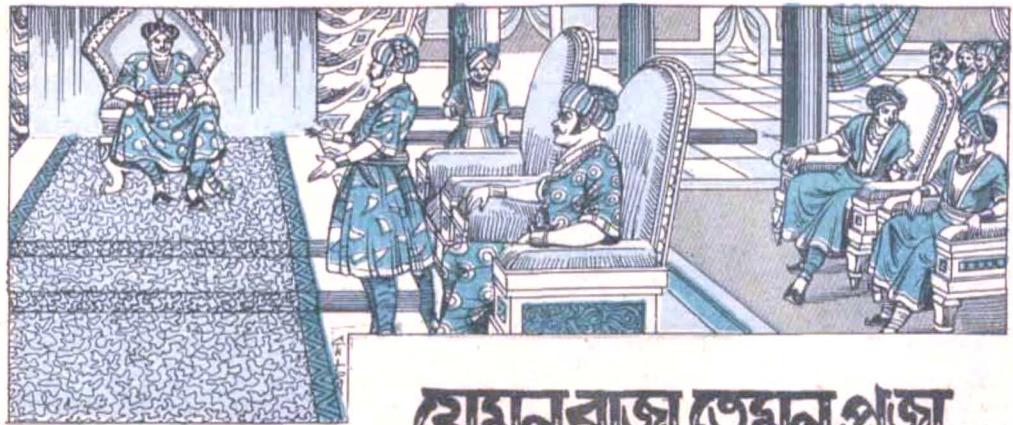
যেমন রাজা তেমন প্রজা

বিজয়পুরের রাজা প্রজাদের নানান রকমের অত্যাচার করত। প্রজাদের উপর সে অনেক রকমের কর বসিয়ে ছিল। কোন শিল্পীকে কাছে ঘেষতে দিত না।

রাজসভায় একদিন রাজা বলল, "আচ্ছা, তোমরা বলত, আমার শাসন ভাল, না, আমার বাবার শাসন অথবা আমার ঠাকুর্দার শাসন ভাল?"

রাজসভার প্রত্যেকে বুঝল যে রাজার এই প্রশ্নের জবাবে যাই বলা হোক না কেন, রাজা সেই জবাবে কোন ক্রমেই খুশী হবে না, অধিকন্তু জবাব যে দেবে তার জীবন বিপন্ন হবে। একজনের শাসন ভাল বললে অন্যের শাসন কেন খারাপ তা রাজা জানতে চাইবে। এই কথা ভেবে সভার প্রত্যেকে একে অন্যের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

মন্ত্রী সভার এই অবস্থা দেখে বিপদের আশংকা করে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বলল, "মহারাজ, আপনার সভায় যারা আছেন তাঁরা শুধু আপনার শাসনকাল ছাড়া অন্য কারো শাসনকাল দেখেনি। তাই, আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া এদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়।"

এই কথা সত্য ভেবে রাজা মন্ত্রীকে বলল, "তাহলে এমন লোক খুঁজে বের করা হোক যে আমাদের তিন জনের শাসনকাল দেখেছে।"

বেরিয়ে পড়ল রাজার লোকজন। পথে বুড়োদের দেখলেই প্রশ্ন করত, "এই বুড়ো, তুমি রাজার ঠাকুর্দার শাসন দেখেছ?" সভায় যা হোল তা সারা দেশে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই, প্রত্যেক বুড়ো এই ধরনের প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে বলে উঠলো, "আমি দেখিনি।" এই ধরনের কথা শুনে

পাঁচু স্বর্ণকার

রাজার লোক ভাবল, একজনকেও না নিয়ে গেলে তারা আর প্রাণে বাঁচবে না।

গোটা দেশ ঘুরে শেষে ওরা এল এক পানওয়ালার কাছে। সেই পানের দোকান-দারও বুড়ো হওয়ায় ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, রাজার ঠাকুর্দাকে চেনেন?"

পানওয়ালা বেশ মেজাজে বলল, "আমি রাজার ঠাকুর্দাকে চিনব না কেন? আমাদের একদিনে এক শিক্ষকের কাছে হাতে খড়ি হয়েছে।"

"তাহলে আপনি নিশ্চয় রাজার বাবার শাসনকালেও ছিলেন, চলুন আমাদের সাথে।" বলল রাজার লোক।

"কেন, যেতে হবে কেন?" পানওয়ালা জিজ্ঞেস করল।

রাজার লোক সব কথা বলল। পানওয়ালা মনে মনে ভয় পেয়ে ঠাকুরের নাম করতে করতে ওদের সাথে গেল।

রাজা এর আগে যে প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্ন পানওয়ালাকেও করল।

"মহারাজ আমি পান সাজতে পারি, রাজনীতির কি বুঝি! তবু, আপনার ঠাকুর্দার আমল থেকে আপনার আমল পর্যন্ত আমার মধ্যে যে পরিবর্তন গুলো হয়েছে, যে ভাবে হয়েছে, তা জানাচ্ছি। আমি যা বলব তা শুনে আপনি ঠিক করবেন কার আমলের শাসন ভাল।" পানওয়ালা বলল।

"কী সেই পরিবর্তন, জানাও।" রাজা জিজ্ঞেস করল।

পানওয়ালা বলল, "মহারাজ, আপনার ঠাকুর্দার আমলে আমাদের বাড়ির সামনে এক বুড়ো এবং তার এক নাতনী ছিল। একদিন সেই বুড়ো আমাকে ডেকে বলল, 'বাবা, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। বড় ইচ্ছে ছিল, আমার এই নাতনীর বিয়ে আমি নিজের হাতে দেব, কিন্তু আমার কপালে নেই। আমার এই নাতনীর বিয়ের জন্য আমি দুহাজার মুদ্রা জমিয়ে রেখেছি। ওর বিয়ে এই মুদ্রা খরচ করে দেওয়ার ভার তোমার

হাতে দিয়ে যাচ্ছি।' বুড়ো আমার হাতে দুহাজার মুদ্রা রেখে মারা গেল।

"বুড়োর কাছে কথা দিয়েছিলাম। অনেক দেশ ঘুরে ভাল পাত্র দেখে বুড়োর নাতনীর সাথে বিয়ে দিলাম। দুহাজার মুদ্রা বুড়োর নাতনীকে দিলাম।

"তারপর, অনেক বছর কেটে গেল। আপনার ঠাকুর্দা স্বর্গে গেলেন। আপনার বাবার শাসনকাল শুরু হল। সেই সময় বুড়োর নাতনীকে দেখলাম একদিন আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে মনে বলে উঠেছিলাম, কী বোকার মত কাজ করেছি। আমার কাছে যে বুড়ো দুহাজার মুদ্রা দিয়েছিল তা তার নাতনী জানত না। তাই ভাবলাম সেই মুদ্রা না দিলেই বা কে জানত? আমার ভীষণ দুঃখ হল!"

"এই সেদিন আবার ঐ বুড়োর নাতনীকে দেখতে পেলাম, এবারে বোকামীর জন্য আরও দুঃখ হল। আমি কী বোকা ছিলাম। তা না হলে সোজা ঐ বুড়োর নাতনীকে বিয়ে করে নিলে ওর সব কিছুইতো একেবারে আমার হয়ে যেত!" এইভাবে পানওয়ালা তার মনের পরিবর্তনের কথা জানাল।

এই কথা শুনে রাজা খুব খুশী হয়ে সেই পানওয়ালাকে একশো মুদ্রা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। রাজা ভাবল, তার বাবার আমলে পানওয়ালার বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে আর তার নিজের আমলে বুদ্ধি পূর্ণরূপ পেয়েছে।

কিন্তু রাজ সভার সবাই সেই রাজার মূর্খতার পরিচয় পেয়ে মনে মনে হাসল। ওরা ভাবল, এই রাজার ঠাকুর্দা ধর্মাত্মা ছিলেন, তাই তাঁর আমলে লোকের মনে কোন রকল অধর্ম কাজ করার কথা জাগত না। এই রাজার বাবা তত খারাপ লোক না হলেও ধনের লালসা তার ভীষণ ছিল, তাই প্রজারাও সেইভাবে লোভী ছিল। আর এই রাজার আমলে ধনলোভ যে শুধু বেড়েছে তাই নয় ধর্ম-কর্মও একেবারে লোপ পেয়েছে।
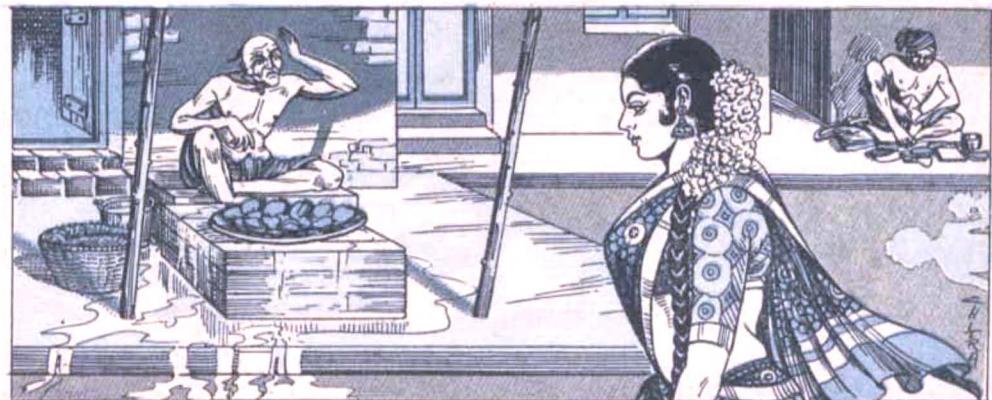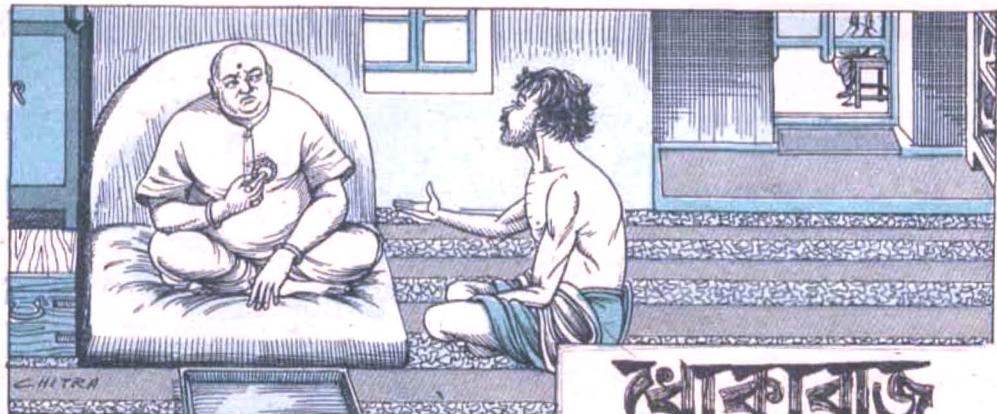
ধোকাবাজ

এক শহরে দীনু নামে এক গরীব কাঠুরে ছিল। প্রত্যেক দিন কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে শহরে সেই কাঠ বিক্রী করত। এইভাবে তার পেট চলত।

একদিন বনে যাওয়ার পথে জঙ্গলে একটি কঙ্কণ পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সেটা দেখে দীনু ভাবল, বনদেবী আমাকে এই কঙ্কণ উপহার দিয়েছেন। এই কঙ্কণ শহরে বিক্রী করে কিছুদিন ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে পারব। এই ভেবে, দীনু শহরে গেল ঐ কঙ্কণ নিয়ে।

সে শহরের এক সেকরার কাছে গিয়ে তাকে বলল, "বাবু, আজ সকালে এই কঙ্কণ কুড়িয়ে পেয়েছি! এটাকে নিয়ে, এর যা দাম হবে তা আমাকে দিন।"

জহুরী ভালভাবে ঐ কঙ্কণ দেখে কি যেন ভেবে বলল, "এর যা দাম হবে তা এখন আমার কাছে নেই। কাল এটাকে নিয়ে তুমি আবার এস। আমি এর যা দাম তা জোগাড় করে রাখব।" বলে কঙ্কণ তাকে ফেরত দিল।

দীনু ঐ কঙ্কণ যত্ন করে ঘরে রেখে বনে চলে গেল কাঠ কাটতে।

এদিকে জহুরী রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল, "দীনু নামে এক কাঠুরে আমার বাড়ি থেকে একটা কঙ্কণ চুরি করেছে। আমি ভালভাবেই জানি, আমার কঙ্কণ ওর ঘরেই আছে। ওর ঘরে তলাশ করে দয়া করে আমাকে আমার কঙ্কণ পাইয়ে দিন।" রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের লোকজনকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন, "তোমরা কাঠুরে দীনুকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।"

রাজার লোক দীনুর ঘর থেকে ফিরে এসে বলল, "মহারাজ, দীনু ঘরে নেই। কাঠ কাটতে গেছে।"

গীতা পাহাড়ী

রাজা জহুরীকে বললেন, "জহুরী, তুমি কাল সকালে এসো। কাঠুরে যে চুরি করেছে তা প্রমাণ করে তোমার কঙ্কণ তোমাকে দেব।"

নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে দেখে জহুরী মনে মনে ভীষণ খুশী হল। ভাবল ঐ কঙ্কণ নিশ্চয় সে পাবে।

পরের দিন জহুরী রাজদরবারে এল। রাজা নিজের লোক পাঠিয়ে কঙ্কণ সহ দীনুকে ধরে আনতে বললেন। দীনু এলে রাজা বললেন, "কিরে তুই জহুরীর বাড়ি থেকে কঙ্কণ চুরি করেছিস ?"

"মহারাজ আমি এ কঙ্কণ চুরি করিনি। এটা আমি জঙ্গলে পেয়েছি। ভেবেছিলাম এটাকে বিক্রী করে দিন কয়েক ভাল ভাবে খেয়ে পরে বাঁচব। তাই আমি এই কঙ্কণ নিয়ে এই জহুরীর কাছে বিক্রী করতে গিয়ে ছিলাম। জহুরী আমাকে বলল, আমার কাছে এর যত দাম তত অর্থ নেই। কালকে এস। পুরো দাম দেব। এ ছাড়া মহারাজ আমি আর কিছু জানি না।" কাঠুরে দীনু রাজাকে বলল।

"মহারাজ, এই কাঠুরেটা যা বলছে সব ডাহা মিথ্যা।" জহুরী বলল।

মন্ত্রী দীনুর হাত থেকে কঙ্কণ নিয়ে

রাজার হাতে দিল। রাজা সেই কঙ্কণ দেখে চমকে উঠলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

আসল ব্যাপার হল, কিছুদিন আগে রাজা শিকার করতে বনে গিয়ে ছিলেন। সেখানে রাজা ডান হাতের কঙ্কণ গভীর বনে হারিয়ে ছিলেন। অনেক খোঁজ করানো হল কিন্তু ঐ কঙ্কণ আর পাওয়া গেল না। রাজা দেখতে পেলেন সেই হারানো কঙ্কণ! রাজা বুঝতে পারলেন, আসলে জহুরীই ধোকাবাজ। তবু, রাজার ইচ্ছা করল জহুরীকে পরীক্ষা করতে। রাজা তাকে ঐ কঙ্কণ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে কঙ্কণ

হারিয়েছিলে এটাই কি সেটা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, এটাই আমার হারানো কঙ্কণ!" এই কঙ্কণ পাবার আশায় জহুরী তৎক্ষণাৎ রাজাকে জবাবে বলল।

তক্ষুনি মন্ত্রী জহুরীকে বলল, "তুমি এই কঙ্কণের জোড়াটাও নিয়ে এস।"

এই কথা কানে যেতেই জহুরীর মাথায় যেন বাজ পড়ল। সাহস করে আস্তে আস্তে বলল, "মহারাজ, এর জোড়া অনেক দিন আগে হারিয়ে গেছে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই দীনুটাই হয়ত ঐ কঙ্কণটাও চুরি করেছে।"

এ-কথায় দিনু ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে গরীবের উপর চুরির অপরাধ চাপানো খুব সহজ।"

রাজা হেসে বললেন, "ওরে পাগল, এবারে তুমি চোর নও, আমিই চোর।" এই কথা বলে রাজা নিজের বাঁ হাতের কঙ্কণ সবাইকে দেখালেন।

জহুরীর যেন দম বন্ধ হয়ে এল। রাজসভার সবাই আশ্চর্য্য হল।

তারপর, রাজা সভার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি জঙ্গলে শিকার খেলতে গিয়ে নিজের ডান হাতের কঙ্কণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই কঙ্কণ এই দীনু কুড়িয়ে পেয়েছে। কঙ্কণটাকে নিয়ে দীনু জহুরীর কাছে গেল বিক্রী করতে। জহুরী কঙ্কণ দেখেই মনে মনে ঠিক করল ঐ কঙ্কণ সে হাতিয়ে নেবে। এই দুর্বুদ্ধি তার মাথায় জাগল। দাম নেই বলে দীনুকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তারপর, আমার কাছে নালিশ করতে এল এই জহুরী। দীনুর উপর অপরাধ চাপিয়ে কঙ্কণ হাতানোর তালে ছিল জহুরী। এখন সবাই বুঝতে পারছ তো কে চোর ?"

এরপর রাজা জহুরীকে কঠোর শাস্তি দিলেন এবং নিজের হারানো কঙ্কণ ফেরত পাওয়ার আনন্দে দীনুকে পুরস্কার দিলেন।
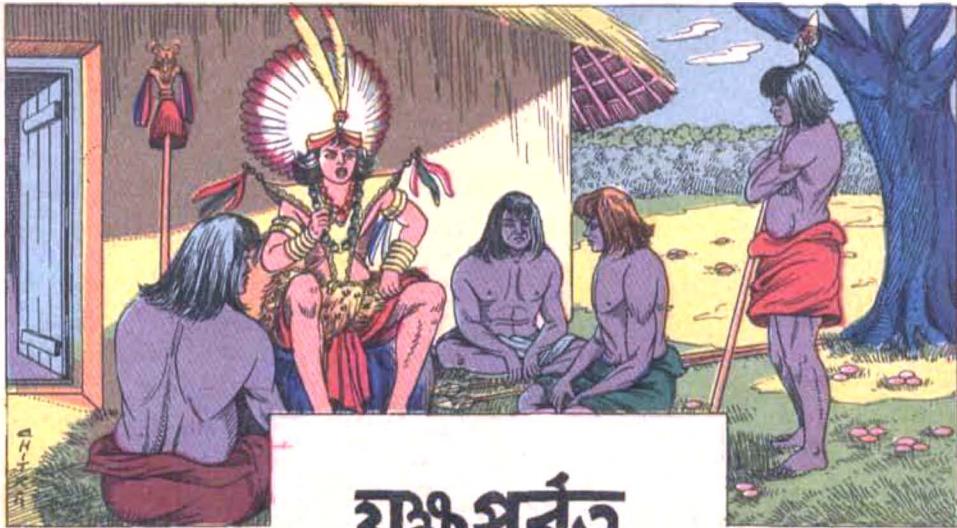
যক্ষপর্বত

চার

[জঙ্গলে শিকার করে ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয়, খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত নিজেদের কুটিরে ফিরে এল। বিঘ্নেশ্বর পূজারীর কাছে লুণ্ঠনকারীদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা তারা শুনল। ঐ লুণ্ঠনকারীদের সন্ধান নিতে চারজন গণ্ডক জাতের যুবকদের পাঠান হল। তারপর···]

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত ভাবল ঐ চারজন গণ্ডক জাতের যুবকদের ফিরে আসার আগে রান্না সেরে প্রস্তুত থাকা উচিত। গণ্ডক জাতের রাজা অরণ্যমাল্লু এবং তার দুজন অনুচর কুটিরের সামনে বসে লুণ্ঠনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল।

"এই লুণ্ঠনকারীদের সম্পূর্ণ খতম না করলে আমাদের বাঁচার আর কোন পথ নেই। বাকি ফসল কেটে ঘরে তোলার সময় আর একবার এই লুণ্ঠনকারীরা আসতে পারে।" অরণ্যমাল্লু বলল।

সেই কথা শুনে মন্ত্রী শিলামুখী মাথা নেড়ে বলল, "মহারাজ, আমাদের গণ্ডকজাতের লোক সেই লুণ্ঠনকারীদের চেয়ে ওদের বাহন, ঐ বিচিত্র জীব দেখে বেশী ভয় পেয়েছে। তারা ভেবেছে ঐ
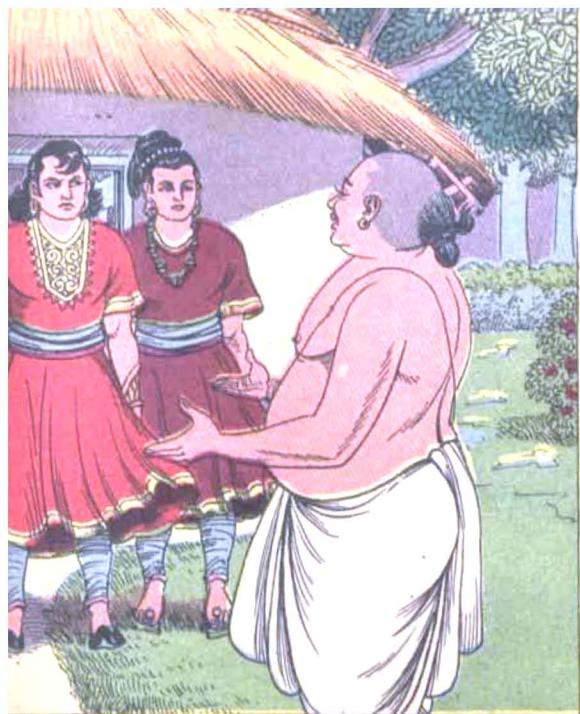
জন্তুগুলো ভীষণ ক্ষতিকর কোন জীব। সেই জন্য, আমার ধারণা, এবারে আমাদের যোদ্ধারা ঐ জানোয়ার দেখে আর ভয় পেয়ে পিছু হটবে না।"

"ক্ষত্রিয় যুবকদের সাহায্যে, আমরা এখনই ওদের ধাওয়া করে, ওদের সর্বনাশ করলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু এখন ভাবছি, ক্ষত্রিয় যুবকরা আমাদের কথায় রাজী হবে কি না।" অরণ্যমাল্লু বলল।

"যুদ্ধের নাম শুনলে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত চান-খাওয়া-ঘুম ভুলে যায়। লুন্ঠনকারীরা স্বর্ণাচারিকেও ধরে নিয়ে গেছে! ক্ষত্রিয় যুবকদের খাওয়া দাওয়া সেরে কুটিরের বাইরে আসতে দিন, তখন ওদের সাথে কথা বলব।" বিঘ্নেশ্বর পূজারী বলল।

ওরা এই ধরনের কথা বলাবলি করছিল। তখনই খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত খাওয়া-দাওয়া সেরে কুটিরের বাইরে এল। বিঘ্নেশ্বর পূজারী জীবদত্তকে অরণ্যমাল্লুর চিন্তাধারার কথা বলল।

"শিকার শেষ করে কুটিরে আসার সাথে সাথে আমার মাথায় এই চিন্তা এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে সেই লুণ্ঠনকারীরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। উট আমাদের গণ্ডারের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত দৌড়াতে পারে। ওরা যখন বুঝতে পারবে যে আমাদের হাতে ওদের মারাত্মক কোন বিপদ হতে পারে তখনই ওরা সোজা পালাবে। তাই সে দুরাত্মাদের খতম করতে হলে ওরা যখন উট থেকে নেমে বিশ্রাম করতে থাকবে ঠিক তখনই ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে।" জীবদত্ত বলল।

"বেশ তাই করা যাবে। আমরা কি এখন আমাদের পঞ্চাশজন যোদ্ধাকে নিয়ে যাব?" অরণ্যমাল্লু দারুণ উৎসাহে বলল।

জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল, "অরণ্যমাল্লু এত যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে

ঐ লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করা যাবে কি করে? ওরা আমাদের সহজেই চিনে ফেলবে এবং পালিয়ে যাবে। সেই জন্য আমি এবং খড়্গবর্মা আগে যাব। প্রথমে আমরা জেনে নেব যে আজ রাত্রে ওরা কোথায় আস্তানা গাড়বে। সুযোগ বুঝে প্রথমে আমরা ওদের নেতাকে খতম করব। বাকি লোকদের হয় আমরা বন্দী করব না হয় এই অঞ্চল থেকে দূরে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই যে চারজন খবর আনতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ফিরে এল। সেই লোকটা যে গণ্ডারের উপর বসে এসেছিল সেই গণ্ডার হাঁপাচ্ছিল।

ঐ লোকটাকে দেখেই অরণ্যমাল্লু ব্যস্ত হয়ে বলল, "লুণ্ঠনকারীদের দেখা পেয়েছ? তোমার সাথে আর যে তিনজন গিয়েছিল ওরা কোথায়?"

গণ্ডকজাতের লোকটা সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দিল। সে যখন তার ঐ তিনজন সাথীসহ যাচ্ছিল তখন দেখল ঐ লুণ্ঠনকারীরা উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। তারপর ওদের অনুসরণ করেছিল। লুণ্ঠনকারীরা এক নদীর ধার দিয়ে যেতে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে ফিরে এসেছে।

"বাকী তিনজন কি লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করছে?" জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আমরা যতক্ষণ না যাচ্ছি ওরা তিনজন ঐ লুণ্ঠনকারীদের নজর বাঁচিয়ে ওদের অনুসরণ করবে।" গণ্ডকজাতের যোদ্ধা বলল।

জীবদত্ত ক্ষণকাল মৌন থেকে পরক্ষণে বলল, "খড়্গ, এখন আমরা রওনা হতে পারি। সূর্যাস্তের পরই ঐ লুণ্ঠনকারীদের আস্তানায় যাওয়া উচিত হবে। তারপর সুযোগ বুঝে ওদের আক্রমণ করব। আজ রাত্রেই স্বর্ণাচারিকে ছাড়িয়ে

আনতে হবে। তা না হলে ওরা স্বর্ণাচারিকে মেরে ফেলতে পারে।"

তারপর, ঐ ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয় তীর ধনুক ছোরা বল্লম হাতে তুলে নিয়ে গণ্ডারের উপর চড়ে এগোতে যাচ্ছে এমন সময় বিঘ্নেশ্বর পূজারী হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এমন ভাবে লাফিয়ে বলল, "ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয়, ওদের ধাওয়া করার জন্য ওদের বাহনকেই ব্যবহার করতে পার। আমাদের সিংহ যে লুণ্ঠনকারীকে মেরে ফেলেছে সেই লোকটার বাহন আশেপাশে জঙ্গলে কোথাও নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। উটে চড়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে পৌঁছানো যাবে।" বলল বিঘ্নেশ্বর।

এই কথা শুনে অরণ্যমাল্লু নিজের অনুচরদের বলল, "তাইতো, সেই বিচিত্র জীবের কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই কুটিরের পিছনেই কোথাও সেটা হবে। যাও, ওটাকে ধরে নিয়ে এস।"

তৎক্ষণাৎ গণ্ডকজাতের চারজন ঐ কুটিরের পেছনের জঙ্গলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেই উট ধরে টেনে আনল খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে। ঐ যুবকদ্বয় সেই উটের উপর রওনা হল। যে যুবক লুণ্ঠনকারীদের খবর আনল সেই যুবক ক্ষত্রিয় যুবকদের সামনে পথ দেখিয়ে যেতে লাগল। সূর্যাস্তের সময় ওরা লুণ্ঠনকারীদের নদীর তীরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাওয়া একটি পথে দেখতে পেল। তারপর, ঐ যে তিনজন গণ্ডকজাতের যুবক আগে থেকেই লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করছিল তারাও এদের সাথে জুটল। অন্ধকার হয়ে এল। তখন লুণ্ঠন নেতা নিজের লোকজনকে নির্দেশ দিল সেখানেই আস্তানা গাড়তে। লুণ্ঠনকারীরা উট থেকে নেমে উটগুলোকে বাঁধল। রান্নার জোগাড় করতে লাগল ওরা। কয়েকজন বেরিয়ে পড়ল শুকনো কাঠের সন্ধানে। বাকি কজন পাথর দিয়ে উনান তৈরি করল।

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত নিজের অনুচরদের নিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে স্বর্ণাচারিকে খুঁজে দেখতে লাগল। স্বর্ণাচারিকে ওরা লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোথাও দেখতে পেল না। জীবদত্ত ভাবল, এই দুরাত্মারা পথেই কোথাও তাকে মেরে ফেলে দেয়নি তো! সে খড়্গবর্মাকে বলল, "খড়্গ, স্বর্ণাচারিকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এই দুরাত্মারা স্বর্ণাচারিকে এখানে আসার পথেই মেরে ফেলেনি তো!"

তা কখনই হতে পারে না। স্বর্ণাচারি ওদের চোখে ধূলো দিয়ে কোথাও পালিয়েছে কি না সন্দেহ হচ্ছে। তবে স্বর্ণাচারির খবর জানা খুবই সহজ ব্যাপার। তুমি এখানেই থাক। আমি এখনই ফিরছি।" বলে খড়্গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করে ওখান থেকে অন্য দিকে চলে যেতে লাগল। জীবদত্ত তাকে থামিয়ে বলল, "কি করতে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?"

কয়েকজন লুণ্ঠনকারী কাঠ কুড়োতে নদী তীরে গেছে। ওদের একজনকে ধরে আনলে সে প্রাণের ভয়ে সব কথা আমাদের কাছে জানিয়ে দেবে।" বলল খড়্গবর্মা।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "এই পরিকল্পনা চমৎকার হবে মনে হচ্ছে। তুমি নিজের সাথে একজন গণ্ডকজাতের লোককে নিয়ে যাও। এমনভাবে কাজটা কর যাতে ওরা টের না পায় যে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি।"

খড়্গবর্মা একজন গণ্ডকজাতের যুবককে নিয়ে চলে গেল। অদূরেই সে লুণ্ঠনকারীদের একজনকে দেখতে পেল। লোকটা এদের দেখে চীৎকার করার জন্য হাঁ করতেই খড়্গবর্মা এক লাফে তার কাছে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল।

লুণ্ঠনকারীরা শুধু যে শুকনো কাঠ কুড়োচ্ছিল তাই নয়, শুকনো ডালগুলোকেও ভেঙ্গে ফেলছিল। খড়্গবর্মা

কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল। খড়্গবর্মা তার অনুচরকে একটা গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিচে ফেলতে বলল। সেটা নিচে সশব্দে পড়ার সাথে সাথে ওরা একটা গাছের আড়ালে লুকালো। পর-ক্ষণেই একজন লুন্ঠনকারী ঐ ডালের কাছে এলো। সেই লুন্ঠনকারী ঘূণা-ক্ষরেও টের পেল না যে ঐ ডাল গাছ থেকে কেন পড়ল।

লোকটা ঐ ডাল টেনে নিয়ে যেতে যাবে এমন সময় খড়্গবর্মা পেছন দিক থেকে গিয়ে তার গলা ঝাপটে চেপে ধরল দু হাতে। ঠিক সেই মুহূর্তে গণ্ডকজাতের ঐ লোকটা এসে তার বুকের কাছে বল্লম উঁচিয়ে ধরে বলল, "চেঁচালে দেব শেষ করে।"

প্রাণের ভয়ে কাঁপছিল ঐ লুন্ঠনকারী। খড়্গবর্মা তাকে বলল, "কোন কথা না বলে চুপচাপ আমার সাথে এসো। তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু একবার যদি চেঁচানোর চেষ্টা কর তো তোমাকে এই খানেই একেবারে প্রাণে মেরে শেষ করে ফেলব।"

লুন্ঠনকারী ভেজা বিড়ালের মত নীরবে খড়্গবর্মার পেছনে হাঁটতে লাগল। জীবদত্ত লুন্ঠনকারীকে দেখে ভীষণ খুশী হয়ে খড়্গবর্মাকে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারলে! এই লোকটা কি জানিয়েছে স্বর্ণাচারির খবর?"

"এখন পর্যন্ত একে কোন প্রশ্ন করিনি। এর অনুচররা ওখানে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই, আমি সোজা তোমার কাছে একে নিয়ে এসেছি।" খড়্গবর্মা বলল।

"ওরে এই, তোমরা লুন্ঠন করে ফেরার পথে যে স্বর্ণাচারিকে ধরে এনেছিলে তাকে কি করলে?" জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল ঐ লুন্ঠনকারীকে।

"সত্যকথা বললে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবেন না তো? ছেড়ে দেবেন তো?"

লুন্ঠনকারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

"নিশ্চয় ছেড়ে দেব। কিন্তু তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, আমাদের যদি ধোকা দাও, তাহলে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। বুঝেছ?" জীবদত্ত সতর্ক করে দিয়ে বলল।

"শুনুন তবে। আচারি সারা রাস্তা 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও' বলে চীৎকার করে ছিল। আসলে আমাদের নেতা তাকে মেরে ফেলতে চায়নি। তাই ওকে ভুট্টার থলিতে পুরে গলায় বেঁধে রেখেছে। এখন ওকে নদীর তীরে আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে।" লুন্ঠনকারী এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল।

"আজ রাত্রে তোমরা কি এখানেই থাকবে? কাল সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে যাবে না কি?" জীবদত্ত আবার প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমাকে মেরে ফেলবেন না তো? আমি সব কথা বলে দিয়েছি।" ঐ লুন্টনকারী বলল।

"তুমি যে কথা বলেছ তা যতক্ষণ না যাচাই করে দেখছি, সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তোমাকে গাছে বেঁধে রাখব। তোমার মুখে গাছের পাতা পুরে দেব, যাতে তুমি চিৎকার করে তোমার লোকজনকে না ডাকতে পার।" এই কথা বলে জীবদত্ত গণ্ডকজাতের একজনকে ইশারায় ডাকল।

গণ্ডকজাতের একজন যুবক ঐ লুন্ঠনকারীকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সাথে ঝুরি দিয়ে বেঁধে দিল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে গেছে। খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত একটা গাছে উঠে লুন্ঠন-কারীদের আস্তানা ভালভাবে দেখে নিল। ঐ আস্তানার এক জায়গায় আগুন জ্বলছিল। ঐ আগুনের কাছে বসে লুন্ঠন-নেতা চার পাঁচজন অনুচরদের সাথে কথা বলছিল। অন্যেরা মাদুর, থলি প্রভৃতি বিছিয়ে শোবার তোড়জোড়

করছিল।

"খড়্গ, আর একটু অন্ধকার বাড়লেই আমরা কাজ শুরু করব। প্রথমে স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করতে হবে। তারপর, গণ্ডকজাতের লোক পাঠিয়ে উট গুলোকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর, আমরা চড়ব গণ্ডারের উপর। অতর্কিতে ঐ ঘুমন্তদের আক্রমণ করে যাকে পারবো তাকে মেরে ফেলব। আর বাকি যারা থাকবে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে।" বলল দেবদত্ত।

"ভাল লাগছে তোমার পরিকল্পনা। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করা। তারপর···" হঠাৎ থেমে খড়্গবর্মা লুণ্ঠনকারীরা যেখানে আস্তানা গেড়েছিল তার পেছনের পাহাড়ের গুহার দিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, "জীবদত্ত, ঐ পাহাড়ের গুহা থেকে কেমন মশালের শিখা দেখা যাচ্ছে দেখ! ঐ অদ্ভুত ধরনের বিকৃত চেহারার রাক্ষুসে লোকটা কে? ওর পেছনে দাঁড়িয়ে যে ভয়ঙ্কর লোকটা কড়া মেজাজে চাবুক চালাচ্ছে সে কে?"

খড়্গবর্মা যে গুহার দিকে তাকাতে বলল সেই দিকে তাকাল জীবদত্ত। ঐ গুহার মুখে একটা মশাল জ্বলছিল। ঐ মশালের আলোতে দেখা গেল অদ্ভুত ধরনের একটা লোক যাদুর একটা দণ্ড না চাবুক কি যেন ঘোরাচ্ছে ঐ লুন্ঠনকারীদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ এক সময় ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষস গর্জন করে উঠল। সাথে সাথে ঐ অরণ্যে, পাহাড়ে সেই রাক্ষসের গর্জন যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। গর্জন করতে করতে সেই রাক্ষস গুহা থেকে বেরিয়ে সোজা লুন্ঠনকারীদের দিকে যেন ছুটে আসছে। তার কপালে অগ্নিপিণ্ডের মত কি যেন দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। (চলবে)

শাসক

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে, গাছে উঠে, শব নাবিয়ে, শব কাঁধে ফেলে [illegible] শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। শবে স্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি, জনতার প্রশংসা পাবার আশায় এই মাঝ রাতে এত পরিশ্রম করছ কিন্তু মনে রেখ জনতা অত তাড়াতাড়ি প্রশংসা করে না। বরং অনেক সময় যা-তা মন্তব্য করে, নিন্দেও করে। প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে হিমশেখরের কাহিনী বলছি, শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।

বেতাল বলল : প্রাচীনকালে সুবর্ণদেশে হিমশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। জনতাকে সুখে রাখার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত ছিলেন। কোন্ কাজ করলে যে প্রজাদের সুখ বৃদ্ধি হবে, আনন্দ বাড়বে সেই কাজ করার জন্য

বেতাল কথা—পঞ্চম

তিনি আগ্রহী থাকতেন। দেশের নানান স্থানে তিনি কূপ এবং পুকুর খনন করা-লেন, রাস্তা বানালেন, রাস্তার ধারে গাছ পোঁতালেন, এছাড়া সরাইখানা ও মন্দির নির্মাণ করালেন। বড় বড় ফুলের বাগানও তৈরি করালেন। এই ধরনের অনেক কাজ করার পরও তিনি ভাব-তেন আর কোন্ কাজ করা যায়, আর কি করলে দেশবাসীর সুবিধা হবে।

একবার হিমশেখর গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর নেবার চেষ্টা করলেন, দেশের মানুষ তাঁর কাজ সম্পর্কে কি ভাবছে তা জানবার। গুপ্তচররা বলল, "মহারাজ, জনতা ভাবছে আপনার শাসনে তাদের আর কোন কিছুর অভাব রইল না। আপনার শাসনে সুবর্ণদেশ পৃথিবীর স্বর্গ হয়ে গেছে। তাই, দেশ-বাসী আপনার শাসনকাল যাতে হাজার বছর স্থায়ী হয় তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।"

রাজা গুপ্তচরদের মুখে শুনে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নিজের কানে শুনতে চাইলেন দেশবাসীর কথা। তাদের আর কোন কিছুর অভাব আছে কি না তা জানার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি একদিন ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন রাজধানীতে। ঘুরে ঘুরে লোকের কথা তিনি শোনার চেষ্টা করলেন।

রাজা ঘুরে ঘুরে দেখতে পেলেন লোকে যে যার কাজে ব্যস্ত। তারা যে কি চায় তার কোন আলোচনা করছে না। ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক জায়গায় দেখতে পেলেন চার পাঁচজন দেশের কথা আলোচনা করছে। রাজা তাদের কাছে গিয়ে আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করলেন।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "অন্য দেশের লোক আমাদের দেশের সব কিছুর খুব প্রশংসা করছে। ওরা বলছে আমাদের দেশের প্রত্যেকে নাকি এক একটা রাজা।"

"ওরা আমাদের রাজার রাজপ্রাসাদ

একবার দেখে নিলে আর কোনদিন ঐ ধরনের কথা বলবে না। আমাদের রাজার ভোগ বিলাসের কথা আর কি বলব। কেমন ঠাটে থাকেন। দু চারটে পুকুর খোঁড়ালেই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাব নাকি? রাজারা কেন পুকুর খোঁড়ে, সরাইখানা গড়ে তোলে জানেন? শুধু দেশবাসীর প্রশংসা পাবার জন্য।" অন্য জন বলল।

অন্যেরা মাথা নেড়ে বলল, "তোমাদের কথাই ঠিক!"

এসব কথা শুনে রাজা মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজা মনে মনে বললেন, দেশবাসী আমার কাজের বিচার এভাবে করছে! আমি শুধু নিজের প্রশংসা পাওয়ার আশাতেই এসব করছি! তাহলে আমি যা কিছু করছি, যে পরিশ্রম করছি, সব বৃথা! আমি তো দেশবাসীর মনে সুখ এনে দিতে পারিনি। ওদের আনন্দ দিতে পারিনি। অতএব, দেশবাসীর জন্য আর কোন কাজ করা উচিত নয়।

কয়েক বছর কেটে গেল। টানা একটি বছর এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। ক্ষেতের মাটি শুকিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। খাদ্যের অভাবে সুবর্ণদেশের মানুষ মরতে বসেছিল। চারদিকে হাহাকার। পথে ঘাটে মানুষ ধুঁকছিল।

রাজা দেশবাসীর এই দুরবস্থা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাজা ভাণ্ডার

উজাড় করে দেশবাসীকে খেতে দিলেন। সমস্ত খাদ্য বস্তু বন্টন করলেন। খাজানা থেকে অগাধ ধন খরচ করে দূর থেকে খাদ্য এনে দেশের মানুষকে খাওয়ালেন।

রাজকর্মচারী দেশবাসীর মধ্যে খাদ্য ঠিকমত বন্টন করছে কিনা তা নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাজা ছদ্মবেশে নানান জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। এবারে রাজা লোকের মুখে যা শুনে ছিলেন তাতে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি শুনলেন, "আমাদের রাজার মত মানুষ কোটিতে একজনও নেই। ইনি শুধু রাজাই নন, আমাদের ভাগ্যেরও বিধাতা।" এই ধরনের ভাল ভাল কথা রাজা অনেকের মুখে শুনেছিলেন।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, হিমশেখর শুরু থেকেই দেশবাসীর সেবা করে আসছিলেন, প্রথমে লোকে কেন তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল? পরে তাঁকেই আবার লোকে কেন একেবারে আকাশে তুলল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে!"

এ-প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বলল, "হিমশেখর হয়ত দেশবাসীর উপকার করেছিলেন। কিন্তু সেই উপকার জনতার কাম্য ছিল না। ঐ সব কাজ করে রাজা হয়ত তাদের চাহিদা সঠিক ভাবে পূরণ করেন নি। যার যা প্রয়োজন থাকে না সে তা পেয়ে ঠিক উপকৃত হয় না। সহজে কোন জিনিস পেয়ে কেউ ততটা আনন্দ পায় না। তার মর্ম বোঝে না। কিন্তু আকালের সময়ে মানুষ খাদ্যের অভাবে হাহাকার করছিল। তাদের সেই অভাব অনটনের দিনে রাজা খাদ্য দ্রব্য বন্টন করায় দেশবাসী দু হাত তুলে পঞ্চমুখে রাজার প্রশংসা করল। তাঁকে আকাশে তুলল। এতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই।"

রাজার মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে পালাল। আবার উঠে বসল সেই শমীবৃক্ষে। (কল্পিত)

পতিব্রতা

আর্মীনিয়া দেশে এক বেকার লোকের বউ ছিল বড় সুন্দরী। সে লোকটা এক-দিন তার বউকে বলল, "আমি অন্য দেশে গিয়ে চাকরি করব। টাকা পয়সা রোজগার করে ফিরব।" তার বউ ছেলেমেয়েকে দেখাশোনার ভার নিজের ছোট ভাইয়ের উপর চাপিয়ে সে চলে গেল। নানান দেশ ঘুরে চাকরি জোগাড় করতে লাগল।

তার বউ খুব ভাল মহিলা। সে নিজের ঠাকুরপোকে রান্না করে ভাল-ভাবে খাওয়াত। ঠাকুরপোর কু-নজর পড়ল তার বউদির উপর। কিন্তু তার বউদি ছিল পতিব্রতা।

তিন বছর পরে সে বিদেশ থেকে খবর পাঠালো যে সে চাকরি করে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করেছে। এবার সে বাড়ি ফিরছে। যেদিন তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল সেদিন ছোট ভাই গাঁয়ের সীমানায় গেল দাদার সাথে দেখা করতে।

"কিরে ভাল আছিস? তোর বউদি আর কাচ্চা-বাচ্চারা ভাল আছে?" ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করল সে।

"বউদির কথা আর জিজ্ঞেস কর না। লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে। ক্রমশ টের পাবে।" ছোট ভাই দাদার কাছে নালিশ করল বউদির বিরুদ্ধে।

দুই ভাই বাড়িতে পা রাখল। বউ এত বছর পর স্বামীর মুখ দেখে ভীষণ খুশী হল। স্বামীর পা ধুয়ে দিলো। সেবা করল। কিন্তু তার স্বামী কোন কথা বলল না। ওরা যখন খেতে বসল তখন তাদের বাড়ির উপর ইঁট পড়তে লাগল। কারা যেন ইঁট ছুঁড়ছে। ছেলেরা তার বাড়ির উপর ইঁট ছুঁড়ছে দেখে মনে

আর্মীনিয়ার লোককথা
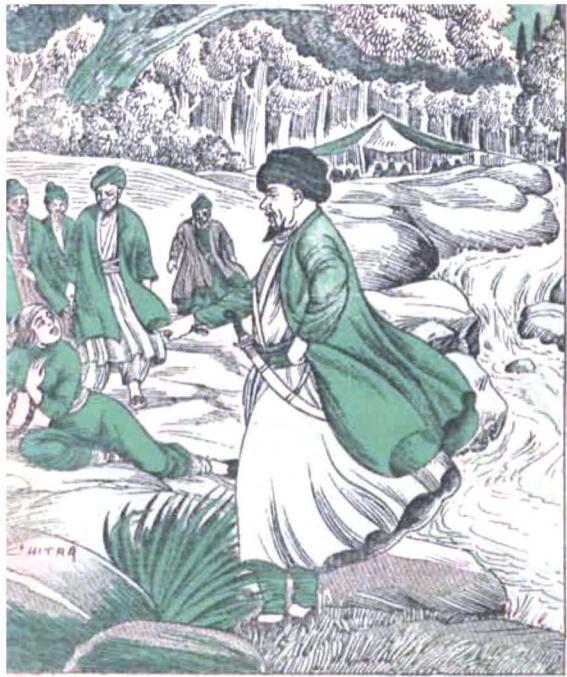
মনে ছোট ভাই খুশী হল। পরক্ষণে বাইরে এসে যারা ইঁট ছুঁড়ছিল তাদের ছোট ভাই বকে তাড়িয়ে দিল।

স্বামীর মুখে কোন কথা নেই দেখে বউ মনে মনে বড় দুঃখ পেল। সে ভাবল, স্বামী হয়ত তত টাকা রোজগার করতে পারে নি। কিছুদিন ঘরের এক কোনে চুপচাপ বসে থাকল সেই স্বামী। তারপর, একদিন বউকে বনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ঐ বনেই বউ এর মৃতদেহ ফেলে রেখে ফিরে গেল স্বামী।

তুর্কীর এক ব্যবসাদার নিজের সাথী-দের নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে সেখানে একটি ঝরনা দেখতে পেল। সেই রাস্তা দিয়ে ঐ ব্যবসাদার আরও বহুবার যাতায়াত করেছে কিন্তু এর আগে কোনদিন ওখানে ঝরনা দেখতে পায় নি। সেদিন ঐ ঝরনার পাশে একটি মহিলার মৃতদেহ দেখতে পেল। তুর্কী ব্যবসাদার ভাবল, কোন চরিত্রহীন-বউকে হয়ত তার স্বামী মেরে ফেলে গেছে।

ঐ ব্যবসাদারের লোকজন উনান ধরিয়ে রান্না করা শুরু করল। তাদের কাছে শুধু শুঁটকী মাছ ছিল। ঝরনার জল এনে তাতে শুঁটকী মাছ ঢালতেই মাছগুলো বেঁচে উঠে জলে সাঁতার কাটতে লাগল।

তারা ভাবল, তাহলে তো এই ঝরনার জলের অনেক গুণ আছে। মরা মাছ বেঁচে উঠছে! ওরা সেই জল এনে ঐ মহিলার মৃতদেহের উপর ছিটিয়ে দিল। সাথে সাথে মৃতদেহ বেঁচে উঠল।

ব্যবসাদার যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। মহিলা কাঁদতে কাঁদতে নিজের কাহিনী শোনাল। ব্যবসাদার বলল, "আমি অবিবাহিত, আমাকে বিয়ে করে চল আমার বাড়ি।"

"আমি তো বিবাহিতা।" মহিলা বলল। ব্যবসাদার অনেক রকমের কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলেও মহিলা তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। সে

বলল যে-লোকটা তাকে হত্যা করেছে সেই তার স্বামী। অন্য কোন লোককে সে স্বামী হিসেবে বরণ করতে পারে না।

ব্যবসাদারের ভীষণ রাগ হল। সে তার লোকজনকে দিয়ে চল্লিশ হাত গভীর গর্ত খুঁড়িয়ে তাতে ঐ মহিলাকে ফেলে দিল। সেই গর্তের মুখে একটা মস্ত বড় পাথর ফেলে রেখে পরের দিন সে সদল-বলে সেখান থেকে নিজের দেশে চলে গেল।

পরের দিন তুর্কী দেশ থেকে অন্য এক ব্যবসাদার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার কানে ভেসে এল এক নারীর কান্নার আওরাজ। নিজের লোককে সে এই কান্নার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে খুঁজে দেখতে বলল। তারা সেই গর্তের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে গর্তের গভীর থেকে ঐ সুন্দরী রমণীকে বের করে ব্যবসা-দারের কাছে আনল।

ব্যবসাদার ঐ মহিলার সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, "কে তুমি? এখানে এভাবে পড়ে আছ কেন?"

মহিলা তার সমস্ত কাহিনী বলল। শুনে ব্যবসাদার বলল, "আমাকে বিয়ে কর, তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না।"

"ক্ষমা করুন। আমি বিবাহিত। অন্যের ধর্মপত্নী।" বলল মহিলা।

"তোমাকে যে হত্যা করেছে এখনও তুমি তাকে স্বামী বলছ?" ব্যবসাদার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।
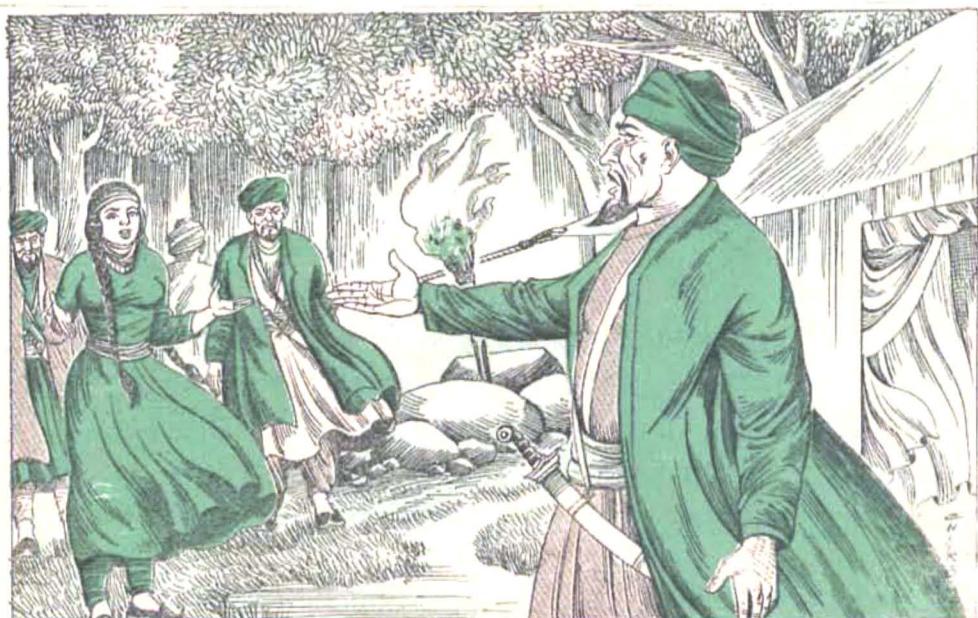
আপনি তো দেশের সামাজিক অবস্থা জানেন যে কোন মহিলার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, একটু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন না।" বলল সেই মহিলা।

ব্যবসাদার তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ভালভাবে খাওয়াল। মহিলা পেট পুরে খেয়ে "এক্ষুনি আসছি," বলে অন্ধকারে কোথায় যেন পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ঐ মহিলার অপেক্ষায় কাটানোর পর ব্যবসাদার বুঝল যে মহিলা পালিয়েছে।

তারপর, সেই মহিলা কুর্দজাতের এক কোচোয়ানের হাতে পড়ল। সে তাকে দুধ রুটি খাইয়ে নিজের করে নেবার কথা ভাবল। তার কবল থেকে বাঁচাব জন্য ঐ মহিলা এক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ নদীর জোয়ারে ভেসে চলে গেল। শেষে মহিলা ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। সমুদ্রের এক জেলে তাকে বাঁচিয়ে, তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। জেলের মা ঐ মহিলাকে গরম জলে চান করিয়ে পরার জন্য নিজের পুরানো কাপড় দিল।

জেলে ঐ মহিলার সমস্ত কাহিনী শুনে বলল, "আমার কোন বউ নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

"আমি তো বিবাহিতা! তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমার বাড়িতে বোনের মত থাকব।" বলল ঐ মহিলা।

"তোমার যা ইচ্ছা।" বলল ঐ জেলে। তারপর থেকে ঐ জেলে সমুদ্রে জাল ফেললেই মোতি পেত। শহরে গিয়ে ঐ মোতি জহুরীর কাছে বিক্রী করে অনেক সোনা পেতে লাগল। প্রত্যেক দিন সোনা রোজগার করত। তাল তাল সোনা সে জমাতে থাকে। সোনা দিয়ে সে যত পারল ধান কিনে জমিয়ে রাখল। সেই ধান রাখার জন্য বড় বড় ধানের গোলা তৈরি করাল।

কিছুকাল . পরে সেই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর এক আকাল দেখা দিল। ক্ষুধার জ্বালায়

মানুষ ছটফট করতে লাগল। জেলে গোলার ধান ক্ষুধার্তদের মধ্যে বন্টন করতে লাগল। ঐ মহিলাও পুরুষের পোশাক পরে ক্ষুধার্তদের মধ্যে খাদ্য বন্টন করতে লাগল। সবার ভালমন্দ দেখা শোনা করতে লাগল।

একদিন ঐ মহিলার স্বামী নিজেই হাজির হয়ে বলল, "আমি আর আমার বাচ্চারা না খেতে পেয়ে মরছি।"

পুরুষ পোশাকে ছিল বলে সে নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল না।

"ঐ ঘরে কিছুক্ষণ বসুন। এদের আগে বিদায় করে আসছি।" স্বামীকে বলল ঐ পুরুষ-বেশী ঐ মহিলা।

লোকটা নিজের স্ত্রীকে একটুও চিনতে পারল না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস তার বউ মরে গেছে। সেই দিনই ঐ তুর্কী ব্যবসাদারদ্বয় এবং ঐ কুর্দা কোচোযানও এলো খাদ্য চাইতে।

কাজ সেরে এসে ঐ মহিলা নিজের স্বামীসহ ঐ চারজনকে জিজ্ঞেস করল তাদের পরিচয়।

প্রথমে ঐ তুর্কী ব্যবসাদারকে মহিলা বলল, "আপনার জীবনে তো অনেক রকমের অভিজ্ঞতা আছে, বলুন তো কোন্ ঘটনা আপনাকে সবচেয়ে বেশী অবাক করেছে।"

"আমি সব চেয়ে অবাক হয়েছি চোখের সামনে এক মৃত মহিলাকে বেঁচে উঠতে দেখে।" একথা বলে সে জানাল কেমন করে সে নিজে ঐ মহিলাকে গর্তে ফেলে ঢাকা দিয়েছে।

পরক্ষণেই অন্য ব্যবসাদার জানাল, কেমন করে সে ঐ গর্ত থেকে মহিলাকে তুলেছে আর তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে মহিলা কেমন ভাবে পালিয়েছে।

তারপর কুর্দ জাতের ঐ কোচোয়ান চেঁচিয়ে উঠল "আমি যে মহিলার সন্ধান পেয়ে ছিলাম সে হয়ত ঐ হবে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাইলাম। কিন্তু সে রাজী হল না। বলল, 'আমি বিবাহিতা।'

তখন আমি জোর খাটালাম। সেই মহিলা তখন এক নদীতে ঝাঁপ দিল।"

তারপর, মহিলা হঠাৎ নিজের স্বামীর দিকে ঘুরে, তাকে বলল, "কোই, আপনি তো আপনার পরিচয় কিছু জানালেন না!"

তখন সেই লোকটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী আর বলব। আমার স্ত্রীকে আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি।"

"হত্যা করলেন কেন? এমন কি ঘটে গেল যে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতে হল?" জিজ্ঞেস করল তার বউ।

আমি টাকা রোজগার করতে বিদেশে গিয়ে ছিলাম। তিন বছর পরে বাড়ি ফিরতেই আমার ছোট ভাই জানিয়ে ছিল যে আমার বউ-এর চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। তাতে আমার ভীষণ রাগ হল। আমি আমার বউকে হত্যা করে ফেললাম। আমার বউ যে কোন অপরাধ করেনি তা অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম। তারপর থেকে দুঃখে শোকে আমি মনে মনে মরে যাচ্ছি।" স্বামী বলল।

"আপনার স্ত্রীকে দেখে আপনি চিনতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করল তার বউ।

"কী বলছেন? নিশ্চয় চিনতে পারব।" বলল ঐ লোকটা।

ঐ মহিলা হঠাৎ এক অজুহাতে অন্য ঘরে গিয়ে পুরুষের পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে হাজির হল ঐ চারজনের সামনে। তাকে দেখে ব্যবসাদার, কোচোয়ান সহ সবাই চিনতে পারল।

তার স্বামী বউ এর পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, "আমি তোমার উপর ভীষণ অত্যাচার করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

"আমি শুধু এই দিনের অপেক্ষাতেই বেঁচে ছিলাম।" সেই মহিলা বলল। বাকি তিনজনও ঐ মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে খাদ্য নিয়ে চলে গেল।

আমি আর বাড়ি ফিরব না। আপনি বাড়ি ছেড়ে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই থাকুন।" স্বামীকে তার বউ বলল। তারপর, তারা জেলের বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগল।

বীণার জন্য ঘি

এক রাজার দরবারে এক বীণা বাদক ছিলেন। রাজা ঐ জ্ঞানী পুরুষকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। সেই বীণা বাদক মুখ ফুটে রাজার কাছে কোন দিন কিছু চাইতেন না। তাই, রাজা নিজেই খোঁজ নিয়ে বীণাবাদকের যে কোন অভাব পূরণ করতেন। কোন কিছু অপূর্ণ রাখতেন না।

বীণাবাদকের মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়ে ওঠল। বীণাবাদক মেয়ের বিয়ের জন্য ভাল পাত্রের খোঁজ পেলেন। বিয়ের যাবতীয় খরচের ভার রাজা নিলেন। কিন্তু সেই বছর দেশে ভীষণ আকাল দেখা দিল। সেই জন্য বীণাবাদক সমস্ত জিনিস জোগাড় করতে পারলেও ঘি-এর ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

বীণাবাদক বুঝলেন স্বয়ং রাজা বাদে আর কেউ এই আকালের দিনে ঘি দিতে পারবেন না। তারপর বীণাবাদক রাজাকে ঘি চাইতে রাজদরবারে গেলেন। কিন্তু রাজার কাছে গিয়ে আর ঘি চাইতে পারলেন না। দারুণ সঙ্কোচ বোধ করলেন।

রাজদরবারে বীণা বাজাতে বাজাতে বীণাবাদক হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আপনি হঠাৎ বীণা বাজানো বন্ধ করে দিলেন কেন?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

"মহারাজ, ঘি চাই।" বীণাবাদকের মুখ থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই আমতা আমতা করে বীণাবাদক বললেন, "মহারাজ, আঙ্গুলে ঘি মাখলে বাজনা মধুর শোনায়।"

রাজা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন, "বীণার জন্য কত গাড়ি ঘি চাই?"

"দুগাড়ি ঘি হলেই যথেষ্ট।" বীণাবাদক উৎসাহের সাথে বললেন।

চৈতালী দাশগুপ্ত
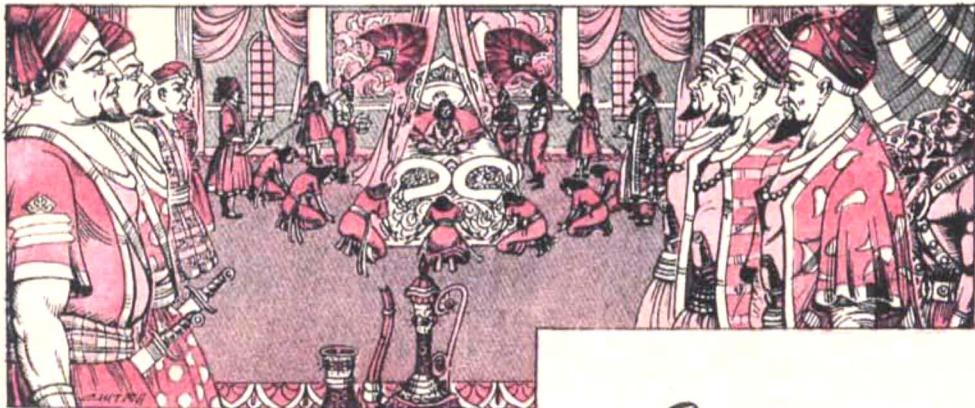
এক দিনের রাজা

দুই

পরের দিন সকালে জফর এবং মনশূর গিয়ে বাদশাহকে জাগাল। তৎক্ষণাৎ তিনি আবুল হোসেনকে যে ঘরে শোয়ানো হয়েছিল সেই ঘরের পর্দার আড়ালে লুকালেন। সেখানে যা কিছু ঘটবে তা দেখার এবং যে কথা হবে তা শোনার সুবিধা ছিল সেই পর্দার আড়াল থেকে।

তারপর জফর এবং মনশূর সহ রাজমহলের প্রত্যেক প্রধান কর্মচারী, নারী এবং গোলাম ঐ ঘরে ঢুকল। সবাই যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় এমন ভাবে দাঁড়াল যেন ঘুম থেকে সত্যি সত্যি তাদের বাদশাহ উঠবেন।

আতর লাগানো এক রুমাল আবুল হোসেনের নাকের ডগায় ধরল এক গোলাম। সাথে সাথে আবুল হোসেন তিনবার হাঁচি ফেলল। তারপর, গোলাম আবুলের নাক, মুখ গোলাপ জলে ধুয়ে মুছে দিল। তখন, আবুলের ঘুম একটু একটু করে ভাঙতে লাগল এবং সে চোখ খুলে তাকাতে লাগল চারদিকে।

আবুল চোখ খুলে দেখল সে যে বিছানায় শুয়ে আছে তা অপূর্ব মনোরম। বিছানার উপরের লাল চাদরে জরির কাজ করা। মাঝে মাঝে মুক্তা লাগানো রয়েছে ঐ চাদরে! মাথা তুলে দেখল বিরাট এক ঘরে সে আছে। ঐ ঘরের মধ্যে চারদিকে দামী দামী বেনারসী কাপড় ঝুলছে। ঘরের কোনে কোনে সোনা এবং স্ফটিক পাত্র রয়েছে। আবুল চারদিকে তাকিয়ে দেখল বহু নারী এবং গোলাম তার চারপাশে রয়েছে। ওরা প্রত্যেকে নত হয়ে তাকে সেলাম করছে। আবুলের পেছনে রয়েছে আমীর ওমরা,

মন্ত্রী, পাহারাদার এবং কালো রঙের হিজড়েও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক উঁচু গদিতে সঙ্গীত বিশারদ গান গাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আবুলের বিছানার কাছেই বাদশাহের পোশাক ছিল। সেই রঙ-বেরঙের পোশাক দেখে আবুল ভাবল ঐ পোশাক বাদশাহের।

আবুল আবার চোখ বুজল। তখন জফর তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তিন-বার সেলাম ঠুকে সবিনয়ে বলল, "হুজুর ঘুমন্ত লোককে ঘুম থেকে তোলার অনু-মতি দিন। নামাজ পড়ার সময় হয়েছে।"

আবুল চোখ কচলাল। নিজের হাতে নিজেই চিমটি কেটে বলল, "বাপরে বাপ্ একি আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! আমি কি বাদশাহ!...ঐ ব্যবসাদারের সামনে আমি যা মুখে এসেছে তাই বলেছি। তারই ফলে হয়ত আমার এ অবস্থা হয়েছে।" বলে মুখ ঘুরিয়ে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করল।

উজীর জফর আবার তার কাছে গিয়ে বলল, "হুজুর মনে হচ্ছে আপনি সকালের নামাজে যেতে চান না। তাই আপনার গোলামরা একটু ইতস্ততঃ করছে। আপনার ওঠার সময় হয়ে গেছে।

আবুল গাইয়েদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করল। গান শুরু হল।
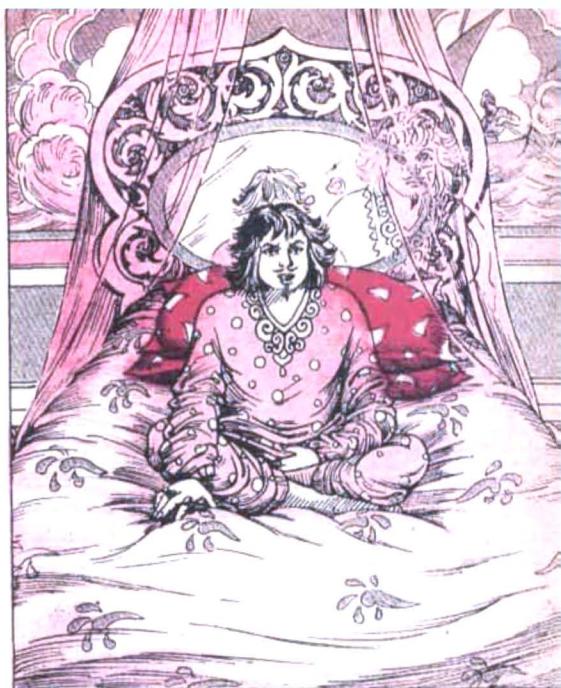
গান আর বাজনার সে এক গমক ও ও মূর্ছনা। আবুল ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে মনে বলল, "ওরে এই আবুল, আর কোন দিন তুই শুয়ে শুয়ে এ রকম গান শুনেছিস?" এই কথা বলে সে হঠাৎ উঠে বসল! সে নিজেব চোখকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মগজে কিছু যেন ঢুকছে না। সে স্বপ্ন দেখছে কি না তাও সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

আবুল নিজের দুহাত ছড়িয়ে দেখল তার হাতগুলো আগের মতই আছে। সে আপন মনে বলল, আরে এই আবুল, "তুই আছিস কোথায়? তুই কি

ঘুমোচ্ছিস না জেগে আছিস? তুই আবার বাদশাহ হলি কবে? এই মহল, এই বিছানা, এই গোলামের দল, এই ঘরানার মেয়েরা, এই নাচিয়েরা, সুন্দরীরা, গাইয়েরা—এরা সব কবে তোর হল?"

ঠিক তখনই গান থেমে গেল। মনশূর আবুলের সামনে নুয়ে তিনবার সেলাম করে বলল, "হুজুর আমার নিবেদন এই যে আপনার নামাজ পড়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনার দরবারে যাওয়ার সময় হয়েছে।

আবুল কি যেন বলতে গেল। তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। সে মনশূরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে এই, তুমি কে? আমি বা কে?"

"আপনি আমাদের বাদশাহ, মুসলমানদের সুলতান! আপনি খলিফা হারুন-অল-রশীদ। আব্বাসের পঞ্চমজন আর আমি আপনার বান্দা, আপনার তরবারি ধরার আজ্ঞা প্রাপ্ত মনশূর!" মনশূর সবিনয়ে নিবেদন করল।

"এই সব মিথ্যা!" আবুল হোসেন চিৎকার করে উঠল।

"হুজুর আমাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য এ ধরণের কথা বলছেন। আপনি হয়ত কোন খারাপ স্বপ্ন দেখছেন।" মনশূর বলল।

আবুল হোসেন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কখনো হাত নাড়ছে, কখনো পা ছুঁড়ছে আবার কখনো চাদর গুটিয়ে ছড়াচ্ছে। এসব কিছু পর্দার আড়াল থেকে বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদ দেখছেন আর অনেক কষ্টে হাসি চাপছেন।

কিছুক্ষণ পরে আবুল বিছানায় উঠে বসে এক কালো গোলামকে প্রশ্ন করল, "তুমি আমাকে চেন? আমার নাম বলতে পার?"

গোলাম মাথা নত করে বলল, "আপনি, একমাত্র আমাদের বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ।"

"ওরে কালো মুখো, তুমি সত্য কথা

বলছ না।" আবুল হোসেন বলল।

তারপর সে এক কলো রমণীকে ডেকে একটা আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, "তুমি এটাতে একটা কামড় দাও তো।" সেই রমণী আবুলের আঙ্গুল জোরে কামড়ে দিল। আবুল তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠল, "ঠিক আছে। আমি তাহলে ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছি। কিন্তু এরা আমার ব্যাপারে যা করছে তা কি সত্য?" ঐ রমণী হাত নেড়ে বলল, "আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। আপনিই তো বাদশাহ-হারুন-অল-রশীদ।"

"ওরে ব্যাটা, শুনেছিস? তুই তো বাদশাহ!" আবুল চিৎকার করে আবার সেই রমণীর দিকে ফিরে বলল, "আজে বাজে কথা বকছিস কেন? আমি কি জানি না, আমি কে?"

ততক্ষণে হিজড়েদের নেতা এসে বলল, "হুজুর, আপনার স্নানের সময় হয়েছে।" একথা বলতে বলতে আবুল হোসেনকে সে বিছানা থেকে নাবাল। আবুলকে বিছানা থেকে নাবানোর সাথে সাথে সবাই বলে উঠল, "বাদশাহের জয় হোক।"

"এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! কাল আমি ছিলাম আবুল হোসেন আর আজ বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ হয়ে গেলাম!" আবুল
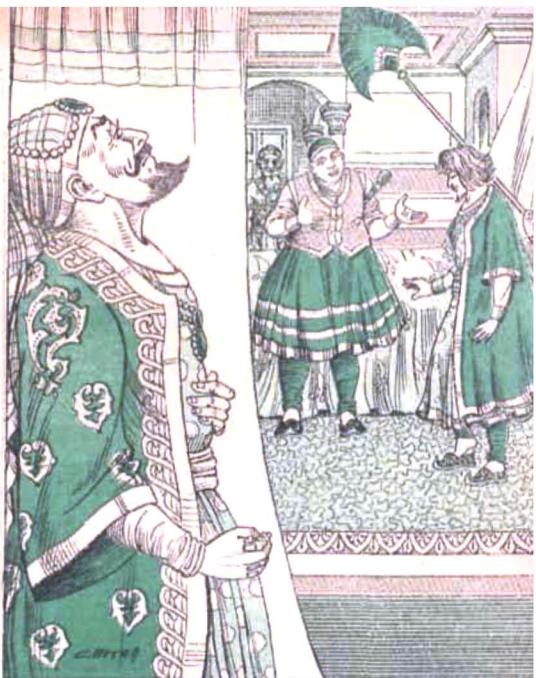
একথা মনে মনে বলল। হিজড়েদের নেতা আবুলের পায়ের কাছে খড়ম রাখল। ঐ ধরনের খড়ম আবুল কোন-দিন দেখেনি। তাতে নক্সা করা সোনার পাত লাগানো আছে, আর মুক্তা জড়ানো আছে। কেউ যেন তাকে ঐ খড়ম জোড়া পুরস্কার দিয়েছে এমন ভাবে আবুল তাতে পা গলিয়ে দিল।

এসব যারা দেখছিল তারা মনে মনে হেসে খুন হচ্ছিল। পর্দার আড়াল থেকে বাদশাহ হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন।

তারপর গোলাপ জলে আবুলকে স্নান করানো হল, বাদশাহের সেই সময়কার

পোশাক পরানো হল, আর তার হাতে রাজদণ্ড দেওয়া হল।

মনে মনে আবুল ভাবল, "আমি কি আবুল হোসেন ?" পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'আমি আবুল হোসেন নই, যে আমাকে আবুল হোসেন বলবে তাকে আমি ফাঁসি দেব। আমি, আমিই। আমিই হারুণ-অল-রশীদ।"

তারপর সে সবার সাথে দরবারে গেল। মনশূর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজদণ্ড তার সামনে আড়াআড়ি রাখল। দরবারের সবাই সহাস্যে আনন্দ প্রকাশ করল।

আবুল দরবারের চারদিকে তাকাল। দরবারে চল্লিশটা দরজা ছিল। দরজায় দরজায় জনতার ভীড়। তরবারি হাতে উজীর, জফর, তরবারি হাতে মনশূর, সেপাই, আমীর, রাজদূত সবাই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ ভীড়ের মধ্যে আবুল লক্ষ্য করল আরও অনেক কর্মচারীকে। জফর এক তাড়া কাগজ আবুলের সমানে এনে এক এক করে পড়তে লাগল। এ সব সেই দিনের বিচারের কাগজ।

বিচারের ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রত্যেকটি বিচারের বিষয় মন দিয়ে শুনে প্রত্যেকটার ব্যাপারে সুচিন্তিত মত জানাল আবুল। পর্দার আড়াল থেকে ঐ বিচার শুনে বাদশাহ বিস্ময় বোধ করছিলেন।

জফরের সমস্ত বিচারের কাগজ পড়ার

পর আবুল কোতোয়ালকে ডাকল। আহমদ তার সামনে এল। আবুল তাকে বলল, "তুমি আবুল হোসেনের বাড়ি যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলের অধীকারীকে ধর। ওর দুজন অনুচর আছে। ওকে আর ঐ দুজনকে ধলে প্রথমে চারশো করে চাবুক কশবে। তারপর ঐ তিনজনকে ছেঁড়া কাপড় পরাবে। উটের পিঠের উলটো দিকে মুখ করে বসিয়ে চারটি অঞ্চল ঘোরাবে। ঘোরাতে ঘোরাতে ঢাক পিটিয়ে বলবে, যারা অন্যদের ইজ্জত নেয়, যারা মেয়েদের ইজ্জত নেয়, যারা মেয়েদের অসম্মান করে, সৎ লোকের নামে যারা নিন্দা প্রচার করে তাদের এই ধরণের শাস্তি দেওয়া হবে। ঐ অঞ্চলের অধিকারীকে ফাঁসি দেবে, অধিকারীর মৃতদেহ আবর্জনায় ফেলে দেবে। অনুচর দুজনকে লঘু শাস্তি দেবে।"

আবুলের কথা শেষ হতেই তাকে সেলাম করে তার নির্দেশ কার্যকরী করতে কোতোয়াল চলে গেল।

তারপর আবুল আরও অনেক নির্দেশ দিল। চাকরিও দিল কয়েকজনকে। কয়েকজনের চাকরি খেল। অন্যান্য রাজকার্যও অনেক নিপুণতার সাথে করল। এসব আড়াল থেকে দেখে বাদশাহ কখনও কৌতুকবোধ করছিলেন।

ঐ কোতোয়াল সমস্ত নির্দেশ পালন করে ফিরে এসে আবুলের হাতে একটা কাগজ দিল। ঐ কাগজে বিশিষ্ট কয়েক-

জনের স্বাক্ষর ছিল। আবুলের আদেশ কার্যকরী হতে যারা দেখেছে তাদের স্বাক্ষর ছিল ঐ কাগজে।
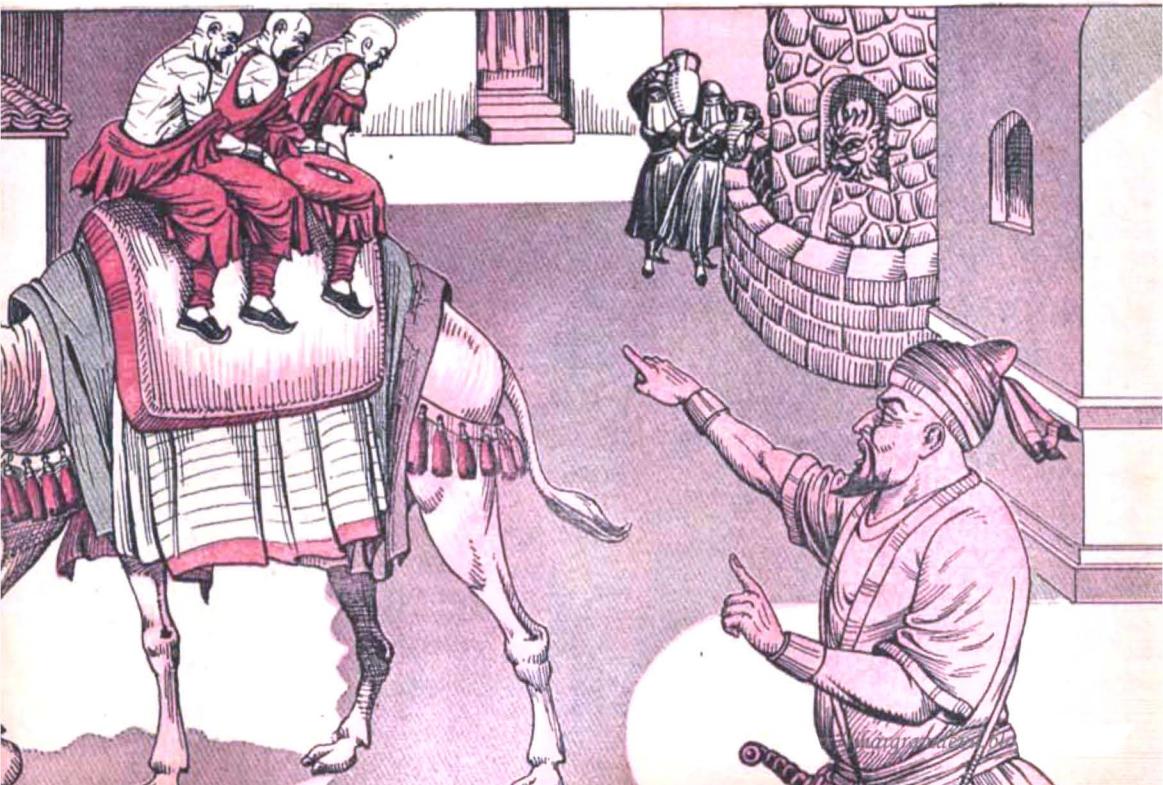
"ভাল কথা, আগামী দিনে যারা মিথ্যা অপবাদ রটাবে, মেয়েদের ইজ্জত যারা নষ্ট করবে, অন্যদের ব্যাপারে যারা অহেতুক নাক গলাবে তাদের আমি এই ধরণের শাস্তি দেব। সবাই ভাল করে শোন।" আবুল ঘোষণা করল।

তারপর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আবুল বলল, থলিতে এক হাজার দীনার নিয়ে আবুল হোসেনের বাড়িতে যাও। আবুলের মাকে প্রণাম করে বলবে, এই হাজার দীনার উপহার দিয়েছেন বলবে! আরও বলবে, খাজানায় তত বেশি দীনার না থাকায় এর বেশি দীনার বাদশাহ দিতে পারেন নি। এই কথা বলে দীনার দিয়ে ফিরে এসে উনি কিভাবে নিলেন, কি বললেন, আমাকে জানাবে।"

কোষাধ্যক্ষ আবুলের নির্দেশ মত কাজ করতে চলে গেল।

আবুল তারপরে ইশারায় জফরকে নির্দ্দেশ দিল দরবারের কাজ শেষ হয়েছে ঘোষণা করতে। জফর দরবারের সবাইকে সেই নির্দ্দেশ জানিয়ে দিল। সবাই সিংহাসনের সামনে এসে নত হয়ে সেলাম করে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত সেখানে রইল শুধু মনশূর ও জফর। ওরা আবুলকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

সেখানে খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করা ছিল। রমণীরা আবুলকে ঘিরে তাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। ভেতরে সুন্দরীরা মধুর গান গাইছিল।

"এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই যে আমি হারুণ-অল-রশীদ। আমি শুনছি দেখছি, সুগন্ধও পাচ্ছি, হাঁটছি। পদে পদে খাতির পাচ্ছি। তাই আমি নিশ্চয় বাদশাহ হারুণ-অল রশীদ।" আবুল মনে মনে বলল। (চলবে)
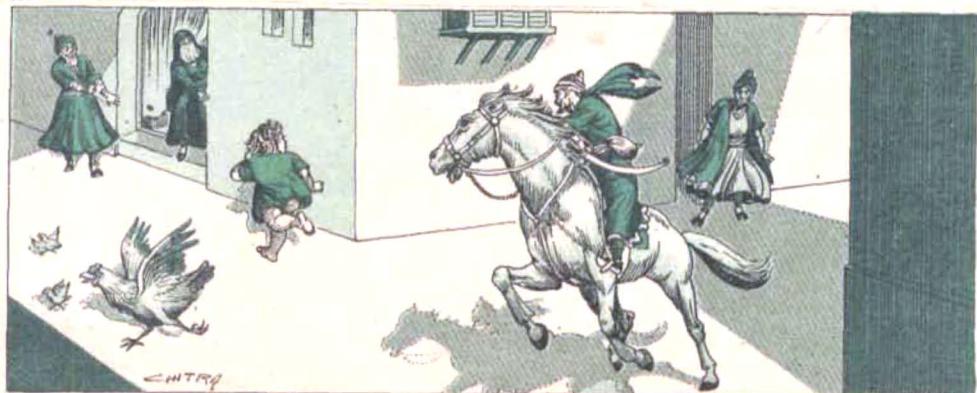
পরামর্শ

একবার প্রসাদ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত এক রাজার দরবারে গেল। নিজের পাণ্ডিত্ব দেখিয়ে সে রাজার কাছ থেকে অনেক সোনা রূপা উপহার পেয়ে আনন্দে সে গ্রামের দিকে চলল। পথে তার দাদার গ্রাম পড়ে। তাই প্রসাদ শাস্ত্রী ভাবল দাদার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দেবে।

প্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা শিব শাস্ত্রী পণ্ডিত হিসেবে তেমন নাম করেনি। অনেক কষ্টে নিজের পরিবারের লোকজনকে সে খাওয়াতে পারত। ছোট ভাই প্রসাদের হাতে এত সোনা রূপার উপহার দেখে তার ভীষণ ঈর্ষা জাগল। রাত্রে প্রসাদ শাস্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে শিবশাস্ত্রী ঐ সোনা রূপা ভরা পুঁটলি নিয়ে সরিয়ে রাখল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রসাদ শাস্ত্রী দেখে তার পুঁটলি নেই। সে দাদাকে এ-ব্যাপার জানাল।

"এ-তো বড় অন্যায় কথা। তাহলে, চোর হয়ত এসেছিল রাত্রে। ছি-ছি এতো বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।" শিবশাস্ত্রী এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

প্রসাদ শাস্ত্রী কি করা উচিত ভেবে নিল। তার মনে সন্দেহ হল তার দাদাই চুরি করেছে। কিন্তু নিজের দাদাকে চোর বলতে তার ইচ্ছে করছিল না। তাই, সে ভেবে চিন্তে ঐ গ্রামের মাতব্বরের কাছে গেল। এমন একটা উপায় বের করতে বলল, যাতে দাদাকে চোর না বলে জিনিস ফেরত পাওয়া যায়।

ঐ গ্রামের মাতব্বরটি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিল। ভেবে, প্রশাদ শাস্ত্রীকে সে একটা পরামর্শ দিল। সেই পরামর্শ প্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে ভাল লাগল।

শ্যামলতনু রায়

কিছুক্ষণ পরে মাতব্বরের দুজন লোক প্রসাদ শাস্ত্রীর হাতে দড়ি বেঁধে শিব শাস্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল। ভাইয়ের ঐ অবস্থা দেখে শিব শাস্ত্রী ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারল না তার ভাই এমন কোন্ অপরাধ করেছে। প্রসাদ শাস্ত্রী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন লজ্জায় দাদার সামনে মাথা তুলতে পারছে না।

মাতব্বর শিবশাস্ত্রীকে বলল, "শুনুন, শাস্ত্রী মশাই, আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনার ভাই এই ধরনের কাজ করবে। জানলাম যে আপনার ছোট ভাই রাজধানী থেকে অনেক সোনা রূপা চুরি করে এনেছে। আমি এই প্রমাণও পেয়েছি যে সে সোজা রাজধানী থেকে এই গ্রামে এসেছে। গতরাত্রে নাকি সে আপনার বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল। তাই আমার ধারণা আপনার বাড়িতেই কোন জায়গায় সোনা রূপা লুকিয়ে রেখেছে। আমরা তদন্ত করে দেখতে চাই। এ কাজ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়।"

তারপর প্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে মাতব্বর চলে গেল। সেখানে রেখে গেল অন্য যারা এসে ছিল তাদের। যাওয়ার সময় বলে গেল যে, সে আরও লোক পাঠাচ্ছে তদন্তের কাজ করার জন্য।

মাতব্বরের ফেরার আগে শিব শাস্ত্রী ঐ সোনা রূপার পুঁটলি লুকানো জায়গা থেকে বের করে প্রসাদ শাস্ত্রী যেখানে রাত্রে ঘুমিয়ে ছিল সেখানে রেখে দিল।

মাতব্বরের লোক, পরে তদন্ত করে ঐ সোনা রূপার পুঁটলি বের করে নিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ শাস্ত্রী সেই পুঁটলি নিয়ে দাদা শিবশাস্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, "তোমাদের গ্রামের মাতব্বরের একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি নির্দোষী। রাজার কাছ থেকে আমি যে এসব উপহার হিসেবে পেয়েছি সে কথা মাতব্বর জানত না। এখন চলি।" একথা বলে সে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল।

যার ভাগ্যে যা

এক গ্রামে এক কিষাণ ছিল। তার কাছে তিন একর অনুর্বর জমি ছিল। সেই কিষাণের রাম এবং সোম নামে দুই ছেলে ছিল। রাম ছিল কুটিল আর সোম ছিল সরল। কিষাণ ভাবল বড় ছেলে রাম কুঁড়ে, তাই তাকে দু একর জমি আর সোমকে দিল এক একর জমি।

বাবা যে ভাবে জমি ভাগ করে দিল ছেলেরা তাই মেনে নিল। রাম বেশি জমি পেয়ে মনে মনে খুশী। সোম ভাবল বাবা যে তাকে কম জমি দিয়েছে তার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

কিছুদিন পরে কিষাণ মারা গেল। দুই ভাই যে যার জমির কাজ করতে লাগল। রাম দুই একর জমির কাজ একা করতে পারবে না। তাই এমনি সোমের কাছে সাহায্য চাইলে সোমকেও সাহায্য করতে হবে তার জমির কাজে। অনেক ভেবে রাম এক ফন্দি আঁটল।

একদিন রাম নিজের ছোট ভাই সোমকে বলল, "ভাই, বাবা আমাকে একবার একটা কথা গোপনে বলে ছিলেন। উনি আমাকে যে দু একর জমি দিয়েছেন তাতে নাকি অনেক ধন পোঁতা আছে। তাই, ভাবছি আমরা দুজনে এই দু একর জমি ভাল ভাবে খুঁড়ে ঐ ধন মাটি থেকে তুলে দুজনে বন্টন করে নি।"

ছোট ভাই বড় ভাইয়ের এই কথা মেনে নিল। দুজনে মিলে ঐ দু একর জমি ভাল ভাবে খুঁড়ল। কিন্তু কোন ধন পেল না।

বড় ভাই জানত যে ঐ ক্ষেতে কোন ধন নেই, তাই খোঁড়া শেষ হতেই সে ছোট ভাইকে বলল, "ভাই, আমাদের কপালে নেই, তাই ধন পাই নি।"

"তুমি তো বললে, বাবা বলেছেন, ধন

অনিমা দাস

মাটিতে পোঁতা আছে।" ছোট ভাই বলল।

"পোঁতা ছিল। হয়তো চোর নিয়ে গেছে।" বড় ভাই রাম বলল।

বড় ভাইয়ের বলার ঢং দেখে সোম অবাক হয়ে বলল, "বাবা আমাকে যে জমি দিয়েছেন হয়তো সেই জমিতে ধন পোঁতা আছে! সেটাও খুঁড়ে দেখলে হত।"

দুজনে কথা বলছে এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা দুজনে মিলেই ক্ষেতের কাজ করবে নাকি ?"

"একটা ব্যাপার আছে। আমার বাবা দাদাকে বলে ছিলেন যে তাকে দেওয়া জমিতে ধন পোঁতা আছে। সেই ধনের খোঁজে আমরা দুজনে সমস্ত ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে ছিলাম। যা পেতাম দুজনে ভাগ করে নিতাম। আমি এখন ভাবছি, কে জানে, বাবা হয়ত ভুলে আমার জমিতেই পুঁতে রেখেছেন। তাই দাদাকে বলছিলাম, এস, আমার জমিটাও দুজনে খুঁড়ে দেখে নি।" সোম বলল।

"আরে সোম, শোন, তোর জমিতে যে ধন উঠবে তার ভাগ আমি চাই না, তুমি একা খোঁড়। যা পাবে তুমিই নাও।" রাম বলল।

রামের কথা শুনে মোড়ল বুঝতে পারল যে রাম ছোট ভাইকে খাটিয়ে নিয়েছে।

অগত্যা সোম একাই নিজের ক্ষেতের মাটি খুঁড়তে লাগল। লাঙ্গল চালায় আর খোঁড়ে। ফলায় কি যেন ঠেকল। সোম কোদাল দিয়ে খুঁড়ে, মাটির গভীর থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করল। সেই বাক্স খুলে দেখল সোনার গয়না ভর্তি।

অত গয়না দেখে রামের চোখ কপালে ঠেকল। মুখ শুকিয়ে গেল। রাম ভাবল, আহা, আমি যদি একটু হাত লাগাতাম তাহলে অর্দ্ধেক গয়না পেতাম।

সোম ঐ বাক্স থেকে ভাল ভাল ভারি ওজনের চারটে গয়না বের করে দাদাকে দিল।

সোমের এই উদার মনের পরিচয় পেয়ে গাঁয়ের লোক তার প্রশংসা করল।

অজানা পণ্ডিত

চীন দেশে সরকারী চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে হত। আজ থেকে কয়েক শতক আগে এক গাঁয়ের পণ্ডিত, তার নাম পাওয়ে স্বান, পরীক্ষা দিতে রাজধানীর দিকে রওনা হল। পথে আর এক যুবক-পণ্ডিতের সাথে তার দেখা।

সেই যুবকের একটা অসুখ ছিল। তাই পাওয়ে স্বান তাকে সহায্য করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু যুবক হঠাৎ একদিন দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

পাওয়ে সেই যুবকের নামও জানতো না। সেই যুবকের কাছে ছিল দশটি রূপার মুদ্রা এবং এক তাড়া কাগজ। পাওয়ে ঐ কাগজ দিয়ে শব ঢাকল। একটা রূপার মুদ্রা দিয়ে ঐ যুবকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করল এবং বাকি নটা রূপার মুদ্রা যুবকের মাথার নিচে রেখে শবটিকে বাক্সে পুরে মাটিতে পুঁতে দিল।

সেই পণ্ডিতের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে পাওয়ে বলল, "তুমি তো মারা গেলে, তবু বলছি, পারতো তোমার বাড়ীর লোককে খবর দিও। আমি জরুরী কাজে যাচ্ছি। এ-ছাড়া আমি তোমার আর কি সাহায্য করতে পারি।"

পাওয়ে রাজধানী পৌঁছাল। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল।

পাওয়ে যখন রাজধানীতে ছিল তখন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা ঘোড়া পাওয়ের কাছে এল। সেই ঘোড়া কিছুতেই পাওয়েকে ছাড়ছিল না। নিরুপায় হয়ে পাওয়ে ঐ ঘোড়াটাকে নিজের ঘোড়ার মত ব্যবহার ও দেখশোনা করতে লাগল।

কিছুদিন পরে পাওয়ে বাড়ি ফিরতে রওনা হল। অনেক দূর যাওয়ার পর

এক জায়গায় রাত হয়ে গেল। কাছেই এক বড় লোকের বাড়ি ছিল। পাওয়ে ভাবল ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালে আবার রওনা দেবে। ঘোড়া থেকে নেমে একটা কাগজে লিখে ঐ বাড়ির চাকরের হাতে দিয়ে পাওয়ে বলল, "তোমার বাবুকে বল, আমি তাঁর সাথে একটু দেখা করতে চাই।"

চাকর ভেতরে গিয়ে মালিকের হাতে ঐ কাগজটি দিয়ে বলল, "হুজুর, এই লোকটা আমাদের ঘোড়াটাকে নিয়ে গেছে।"

মালিক কাগজের টুকরোতে 'পাওয়ে স্বান' লেখা দেখে চাকরকে বলল, "ইনি তো নাম করা পণ্ডিত। কোন বিশেষ খবর আছে নিশ্চয়। তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো!"

পাওয়ে ভেতরে এলে মালিক তাকে বলল, "আমি এই ঘোড়াটাকে গত বছর হারিয়ে ছিলাম। আপনি এটাকে কোথায় পেলেন?"

পাওয়ে গোড়া থেকে তার কথা শুরু করে বলল, "আমি রাজধানী যাওয়ার পথে এক যুবক-পণ্ডিতের দেখা পেয়েছিলাম। বেচারার বুকের দোষ ছিল, যখন তখন তার বুক ধড়ফড় করত। বেচারা ঐ রোগেই মারা গেল।" এইভাবে সব কথা পাওয়ে বলে যেতে লাগল। বাড়ির মালিক হঠাৎ বলে উঠল, "ঐ যুবক আমারই ছেলে হবে।"

পরের দিন সকালে বাড়ির মালিক পাওয়েকে নিয়ে ঐ যুবককে যেখানে পোঁতা হয়েছিল সেখানে গেল। তারপর বাক্সের শবদেহ দেখে বাড়ির মালিক ছেলেকে চিনতে পারল।

তার ছেলের প্রতি পাওয়ে যে দরদ দেখিয়েছে তাতে ঐ মালিক খুশী হল। সোজা সে রাজার কাছে গিয়ে পাওয়েকে যাতে ভাল চাকরি দেওয়া হয় তার জন্য চেষ্টা করল। পাওয়েকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হল। পাওয়ের বিচারক হিসেবে খুব নাম যশ হল।

কলিযুগ

কোন এক সময়ে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণের সাথে এক বণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ কাশী যাবে ঠিক করল। তার কাছে ছিল এক দামী হীরা। সে ঐ হীরা বণিক বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, "বন্ধু, এই হীরাটাকে তুমি তোমার কাছে রাখ। কাশী থেকে ফিরে আমি এটা বিক্রী করে সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।" এ কথা বলে বণিকের কাছে হীরা জমা রেখে সে চলে গেল কাশী।

ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে কাশী পৌঁছাল। কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের দর্শন করে সেই ব্রাহ্মণ দু বছর বাদে নিজের গ্রামে ফিরল।

পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণ বণিক বন্ধুর কাছে গিয়ে ঐ হীরা ফেরত চাইল।

বণিকটি এমন ভাব করল যেন হীরা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সে বোকার মত হাবভাব দেখিয়ে প্রশ্ন করল, "কিসের হীরে ভাই? তুমি আমাকে হীরে দিলে? কবে? কোথায়? কেন?"

ব্রাহ্মণের রাগ হল। সে ঐ বণিক বন্ধুটিকে সোজা রাজার কাছে নিয়ে গেল।

বণিক রাজাকে বলল, "মহারাজ, এই গরীব ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলছেন। ইনি নাকি আমাকে হীরে রাখতে দিয়েছেন!"

রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, "তুমি হীরা দিয়েছ শপথ কর।"

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ সাথে আনা নিজের ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল, "আমি শপথ করে বলছি, আমি এই বণিকের হাতে একটি হীরা রাখতে দিয়েছি।"

ব্রাহ্মণের মুখ থেকে কথাগুলো বেরু-তেই ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেল।

তা দেখে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন "ছি, ছি, ব্রাহ্মণ, তুমি এত বড় মিথ্যা কথা বললে! বেচারা বণিককে চোর

পঙ্কজ মুকুল বসু

বানালে ! মিথ্যা কথা না বললে কখনও ছেলে মারা যায় ? যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে ।"

ব্রাহ্মণের ভীষণ দুঃখ হল। সত্যি কথা বলা সত্ত্বেও ছেলে মারা গেল! মনের দুঃখে সে ছেলের শব নিয়ে শ্মশানে গেল।

এই সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন যিনি সেই ধর্মরাজ এক বৃদ্ধের রূপ ধরে ব্রাহ্মণের কাছে এসে বললেন, "বাবা, তোমার এত দুঃখ কেন ? এই ছেলেটা মারা গেল কি করে ?" ব্রাহ্মণ ঐ বৃদ্ধকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

"ব্রাহ্মণ, তুমি আস্ত পাগল ! তোমার কাশী যাত্রা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কলিযুগ শুরু হয়েছে। কলিযুগে ধর্ম এক পায়ে চলে। এই জন্য তুমি সত্যি কথা বলে ধোকা খেয়েছ। তুমি আবার রাজার কাছে যাও। তোমার এই ছেলের মাথায় হাত রেখেই মিথ্যা কথা বল। তখন দেখবে তুমি ঠিক ন্যায় বিচার পাবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সব বুঝিয়ে বলল। তারপর, সেই ব্রাহ্মণ নিজের ছেলের শব নিয়ে আবার রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। তাই আমার ছেলে মারা গেল। এখন আমার ছেলের মাথায় হাত রেখে সত্য কথা বলছি। আমার বণিক বন্ধুটিকে একটা নয় দুটো হীরা রাখতে দিয়েছিলাম।"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হতেই ছেলে বেঁচে উঠল। রাজা ব্রাহ্মণের কথা এবার বিশ্বাস করলেন। রাজা ঐ বণিককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "পাজী বণিক, ব্রাহ্মণ তোমার কাছে যে দুটো হীরা রাখতে দিয়েছিল সেগুলো ফেরত দাও।"

বণিক বলল, "মহারাজ, এ লোকটা আমাকে একটাই হীরে দিয়েছিল।"

তারপর ব্রাহ্মণ রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নিজের হীরা ফেরত নিল। রাজা ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন এবং বণিককে তিরস্কার করে কারাগারে পুরলেন।

নারীর অনুগত

একবার এক রাজা জমিয়ে গল্প করছিলেন। নানান কথার পর তিনি বললেন, "নারীর জীবন বৃথা। কারণ, নারীরা সব সময় স্বামীর কথায় ওঠে বসে। স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলতে পারে না।" মন্ত্রী রাজার কথায় সায় দিলেন না। তিনি বললেন, "মহারাজ, এই পৃথিবীতে এমন একজন পুরুষও নেই যে নারীর অনুগত নয়।"

এই কথা কতখানি সত্য তা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা জাগল রাজার।

রাজা রাজ দরবারের প্রত্যেককে পরের দিন স্ত্রীদের নিয়ে হাজির হতে বললেন।

"আপনাদের মধ্যে যিনি নিজের স্ত্রীর অনুগত নন তিনি হাত তুলুন।" রাজা বললেন।

কেউ হাত তুলল না। মন্ত্রীর চোখে মুখে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

এক কোণে নজরে পড়ল একজন হাত তুলে বসে আছেন। রাজা খুশী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর অনুগত নও তো?"

"মহারাজ, আমার স্ত্রীই আমাকে হাত তুলতে বলেছেন।" দরবারের ঐ লোকটি বলল।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য

অমৃত

দ্বাপর যুগে উত্তর কুরু ভূমিতে ভৃঙ্গীরস নামে এক সাধারণ গৃহস্থ ছিল। তার মনে অমৃত পান করে অমর হওয়ার একটা ইচ্ছা প্রবল ভাবে জেগেছিল।"

এই ইচ্ছা পূরণের জন্য ভৃঙ্গরস গন্ধ-মাদন পর্বতে গেল। সেখানে দেবতারা ঘুরে বেড়াত। সিদ্ধদের সাথে সেইখানেই তার পরিচয় হল।

ভৃঙ্গীরস তাদের জিজ্ঞেস করল, "অমৃত পাওয়ার উপায় কি ?"

"অমৃত পাওয়ার একমাত্র উপায় তপস্যা। তপস্যা করেও অনেক সময় অমৃত পাওয়া যায় না। তুমি চাও তো আমাদের কাছে যে সব সিদ্ধ বিদ্যা রয়েছে তা শেখাতে পারি।" সিদ্ধরা বলল।

ভৃঙ্গীরস তাদের কাছ থেকে সিদ্ধ বিদ্যা শিখে নিল। তারপর দেবতাদের সেই ভ্রমণ স্থান ছেড়ে ভৃঙ্গীরস বনে চলে গেল। সেখানে বসে তপস্যা করতে চাইল কিন্তু তা পারল না।

কারণ, জঙ্গলের বিভিন্ন আস্তানায় যে সব লোক ছিল তারা অচিরেই জানতে পারল যে ভৃঙ্গীরস বৈদ্য বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তাই তারা দলে দলে ভৃঙ্গরসের কাছে আসতে লাগল। ভৃঙ্গীরস কাউকে তেমন ওষুধ দিত না। তার মতে কিছু কিছু অসুখের মূলে আছে খারাপ অভ্যাস। জনে জনে ধরে ধরে অসুখটা যে কি তা বুঝত। এবং এক এক জনকে এক একটা খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলত। অনেকে ওর কথামত বদ অভ্যাস ত্যাগ করে রোগমুক্ত হল। কিছু অসুখ প্রাণা-য়াম করিয়ে সারাল। কিছু লোকের অসুখ সারাল যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে।

এইভাবে ভৃঙ্গীরসের নাম ঐ জঙ্গল থেকে ছড়াতে ছড়াতে নানান দেশে ছড়িয়ে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

পড়ল। কাতারে কাতারে লোক তার কাছে আসতে লাগল। ভৃঙ্গীরস তাদের বসার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করল। দেখতে দেখতে ভৃঙ্গীরসের বাসস্থানকে ঘিরে বন কেটে বসতি গড়ে উঠল।

অত লোক একত্রে থাকার ফলে তাদের শাসন করার দায়িত্বও নিতে হল ভৃঙ্গীরসকে। কিছু কিছু নিয়ম কানুনও তৈরি করল। ক্রমশ নানা ধরণের দ্বায়িত্ব ভৃঙ্গীরসের উপর পড়তে লাগল। শেষে একদিন সে ভাবল, এইভাবে লোকের সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে তার অমৃত প্রাপ্তির সাধনা পূর্ণ হবে না। তাই, সে এই সব কাজ দেখাশোনার জন্য কিছু শক্ত সমর্থ যুবককে সিদ্ধ বিদ্যা শিখিয়ে ভৃঙ্গীরস একদিন গভীর রাত্রে সে নিজের হাতে গড়া সে অঞ্চল ত্যাগ করে চলে গেল। সাথে নিল চারজন শিষ্যকে।

ভৃঙ্গীরসের চলে যাওয়ার পর নানান লোকের মুখে নানান কথা শোনা গেল। কিছু লোক ভৃঙ্গীরসকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলল। অসুস্থ লোককে সেবা করবার জন্য মুনির বেশ ধরে ঈশ্বর এসেছেন। নিজের কাজ শেষ করেই উনি চলে গেছেন। তারপর তারা ভৃঙ্গীরসের নামে একটা মন্দির নির্মাণ করে তাকে পূজা করতে লাগল।
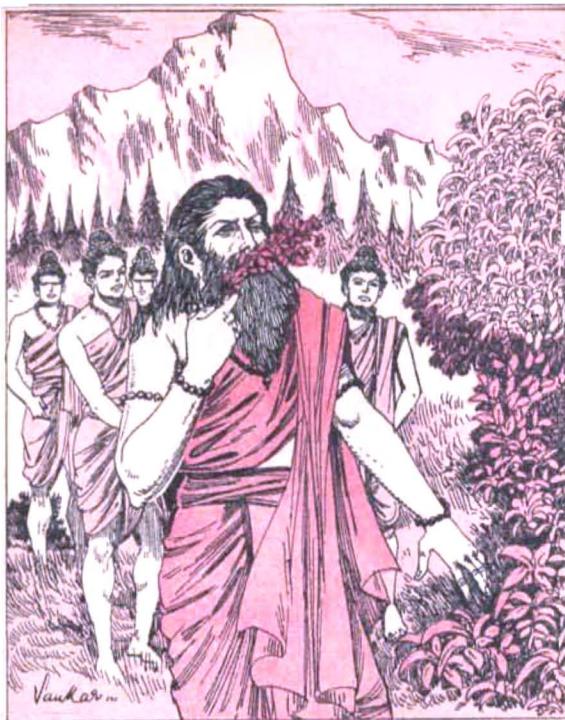
ইতিমধ্যে ভৃঙ্গীরস নিজের ঐ চারজন শিষ্যকে নিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে লাগল। তারা পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে ঘুরে ভৃঙ্গীরস যে সব শেকড় আর পাতা দেখিয়ে দিয়েছিল সেগুলো জোগাড় করতে লাগল। ভৃঙ্গীরস তপস্যা বলে যে শক্তি অর্জন করেছিল তার জোরেই নিজের প্রয়োজন মত লতা পাতা শেকড় জোগাড় করে নিত।

এই ভাবে অনেক বছর তপস্যা এবং সাধনার ফলে, অনেক পরিশ্রমের পরে ভৃঙ্গীরস অমৃত পেল। কিন্তু তার মনে হল তার চারজন শিষ্য হয়ত এখন অমৃত পানের অযোগ্য। তাই সে ঐ

চারজন শিষ্যকে একটা পরীক্ষা নিতে চাইল। ভৃঙ্গীরস যে অমৃত পেল তা একটা মাটির পাত্রে রেখে সামনে নিয়ে বসল। চারজন শিষ্যকে ডেকে বলল, "আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই জিনিষ তৈরি করেছি। আমি জানি না এটা অমৃত না অন্য কিছু। তবে জানা যাবে একমাত্র এটা পান করার পর। ভাগ্য যদি আমার প্রসন্ন হয় তবে এটা অমৃত হবে আর তা না হলে হবে না।"

ভৃঙ্গীরস সেই মাটির পাত্রের জিনিস পান করে নিচে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে চারজন শিষ্য আশ্চর্য হয়ে গেল। দু একজন শিষ্য বলল, "আমাদের গুরু অমৃতের পরিবর্তে বিষ তৈরি করেছেন।"

কিন্তু কৃণু নামক একজন শিষ্য বলল, "আমাদের গুরু মস্ত বড় তাপস। বিনা কারণে উনি এই জিনিস পান করতে পারেন না।" সেই শিষ্যও ঐ জিনিস একটু পান করে ধপ করে নিচে পড়ে গেল।

"এই জিনিস পান করে এত সকাল সকাল মরার চেয়ে আর চার জনের মত সময় হলে মরা অনেক ভাল।" এই কথা বলে বাকি তিনজন শিষ্য সেখান থেকে সরে পড়ল।

তাদের চলে যাওয়ার পর ভৃঙ্গীরস কৃণুকে বলল, "বাছা, আমরা দুজনে মৃত্যুকে জয় করেছি। আমি এই পৃথিবীতে অনেক কাল বেঁচে আছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার শক্তি আমার অর্জিত হয়েছে। আমি স্বর্গে চলে যাব। তোমার বয়স অনেক কম। এই জীবনের প্রতি যতদিন না তোমার বিরক্তি জাগে ততদিন তুমি এখানে থাক। এই জীবনের প্রতি তোমার যখন বিরক্তি জাগবে তখন তুমিও আমার মত সশরীরে স্বর্গে চলে এস।" এই কথা বলে ভৃঙ্গীরস আকাশে উঠে চলে গেল।

কৃণু কয়েক হাজার বছর এই পৃথিবীতে ছিল। তারপর মানব সমাজ থেকে একদিন সশরীরে স্বর্গে চলে গেল।

তরকারির স্বাদ

এক গ্রামে ছিল এক জমিদার। সেই গ্রামে গোকুল দাস নামে এক অনাথ বালক ছিল। তার স্বভাব ছিল খুব ভাল। বালকটি বুদ্ধিমান। তাই, জমিদার সেই বালকটিকে খুব স্নেহ করত। জমিদার সেই বালকটিকে একটু জমি দিয়ে বলল, "তুমি এই জমি চাষ আবাদ কর আর তোমার যখন যা দরকার হবে আমার কাছে চেয়ে নিয়ো।"

গোকুল জমিদারের কাছে শুধু আটা নিয়ে যেতো আর রুটি খেত। জমিদারের কানে গেল ব্যাপারটা। জমিদার ভাবল গোকুল হয়ত তরকারি নিজের ক্ষেতে উৎপাদন করে।

একদিন জমিদার বেড়াতে বেড়াতে গোকুলের কুঁড়ে ঘরের দিকে চলে গেল। সেই সময় গোকুল রুটি খাচ্ছিল। সে-দৃশ্য জমিদার দেখল।

"গোকুল, তুমি শুধু রুটি খাচ্ছ কেন?" তরকারি ছাড়া রুটি খাওয়া যায়? জমিদার জিজ্ঞেস করল।

গোকুল হাসি মুখে বলল, "আজ্ঞে, আমার শুধু রুটি হলেই চলে। তরকারি খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই।"

"তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে এসো। তোমাকে সমস্ত রকমের তরকারি খাওয়াব। সব তরকারি চেখে দেখতে পারবে।" জমিদার বলল।

"হুজুর, ক্ষেতের কাজ করে আমি সময় পাই না। সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয় যাব এক দিন।" গোকুল বলল।

তারপর একদিন জমিদারের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হল। জমিদার সেদিন সবাইকে তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। জমিদার গোকুলকেও ডাকতে গেল। স্বয়ং জমিদার ডাকতে আসায়

অণিমা মুখোপাধ্যায়

গোকুল বাধ্য হল তার সাথে যেতে।

গোকুল যখন জমিদারের সাথে গেল তখন সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাতা অদূরে পড়ে আছে।

"আজ তুমি প্রত্যেকটা তরকারি চেখে দেখবে। আমরা দুজনে একসাথে খেতে বসব।" জমিদার বলল।

"আজ্ঞে, তরকারি আর খাওয়ার কি দরকার। এমনি দেখেই স্বাদ পেয়ে যাব।" গোকুল বলল।

জমিদার কৌতুক বোধ করে বলল, "তাই নাকি? তাহলে চল আজ যতগুলো তরকারি রান্না হয়েছে প্রেত্যেকটা তুমি এক পলক দেখে বলবে কোনটা ভাল।"

আমি তো তরকারিগুলোর নাম জানিনা, আপনি দেখাবেন, আমি সব দেখে তাদের মধ্যে কোনটার স্বাদ সবচেয়ে ভাল, আপনাকে জানাব।" গোকুল বলল।

ওরা দুজনে রান্না ঘরে গেল। গোকুল একটা তরকারির দিকে তর্জনি দেখিয়ে বলল, "এইটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে।"

জমিদার হেসে বলল, "এটা? পাগল কোথাকার। মাছ মাংস থাকতে তোমার কাছে সবচেয়ে স্বাদের হল কিনা ঘন্ট। অবশ্য তুমি তো খাওনি, তুমি জানাবে কি করে কোনটার কি রকম স্বাদ।"

পরে দুজনে খেতে বসল। সব তরকারি খাওয়ার পর জমিদার বুঝল গোকুলের কথাই ঠিক। তাই, জমিদার গোকুলকে প্রশ্ন করল, "গোকুল, তুমি তরকারি দেখে কেমন করে বুঝলে যে এই ঘন্টটার স্বাদই সবচেয়ে ভাল?"

গোকুল হাসতে হাসতে বলল, "আজ্ঞে, আমি ঐ যে পাতাগুলো ছড়িয়ে ফেলা আছে সেগুলো ভাল করে দেখে ছিলাম। দেখলাম আপনার এই তরকারিটা কেউ ফেলে নি। চেটেপুটে খেয়েছে! তাতেই বুঝলাম যে এই ঘন্ট সবচেয়ে ভাল স্বাদের হয়েছে।

জমিদার গোকুলের প্রখর বুদ্ধির জন্য তাকে দপ্তরে চাকরি দিল।
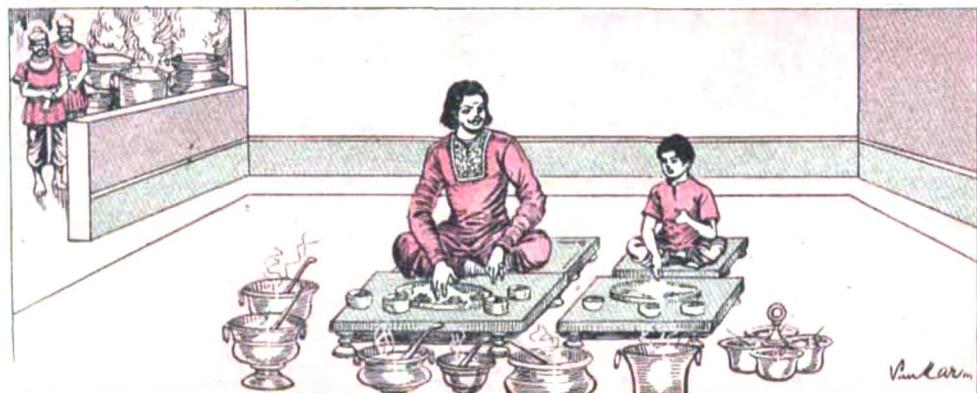
পতঙ্গপালের ন্যায় তীর নিক্ষেপ করে অর্জুন কুরুসেনাদের ঢেকে ফেললেন। তাঁর শঙ্খের শব্দে, রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজে, গাণ্ডীবের টংকারে, এবং ধ্বজস্থিত অমানুষ ভূতগণের গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। লুন্ঠিত গরুর দল লেজ উপর দিকে তুলে হম্বা হম্বা শব্দে ছুটে গেল। এবং মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় করে অর্জুন দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এমন সময় কুরুপক্ষের অন্যান্য বীর-গণকে দেখে তিনি উত্তরকে বললেন, "কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল।"

দুর্যোধনের ভ্রাতা এবং আরও কয়েক জন বীর যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে এলেন, কিন্তু অর্জুনের তীরে বিদ্ধ হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হলেন। কর্ণও অর্জুনের বজ্রতুল্য বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যুদ্ধের সামনের সারি থেকে প্রস্থান করলেন।

অর্জুনের আদেশ মত উত্তর কৃপা-চার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপ পড়ে গেলেন। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য অর্জুন আর বাণ মেরে আঘাত করলেন না। কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও কৃপের কবচ ধনু রথ ও ঘোড়া বিনষ্ট করলেন।

দ্রোণাচার্যের সামনে হাজির হয়ে অর্জন অভিবাদন করে হাসিমুখে সবিনয়ে

বললেন, “আমরা বনবাস শেষ করে শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আপনি আমাদের উপর রাগ করতে পারেন না। আপনি যদি আগে আমাকে আঘাত করেন তবেই আমি আঘাত করব। দ্রোণ অর্জুনের প্রতি অনেকগুলি বাণ ছুঁড়লেন। তখন দুজনে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের বাণে বাণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। অশ্বত্থামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করলেন। কিন্তু রাগও করলেন। অর্জুন অশ্বত্থামার দিকে এগিয়ে গিয়ে দ্রোণকে সরে যাবার পথ করে দিলেন। দ্রোণ ক্ষত-বিক্ষত দেহে প্রস্থান করলেন।

অর্জুনের সাথে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বত্থামার বাণ শেষ হয়ে গেল। তখন অর্জুন কর্ণের দিকে ছুটে গেলেন। দুজনের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হবার পর অর্জুনের বাণ কর্ণের বুকে বিঁধে গেল। তিনি ব্যথায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পালিয়ে গেলেন।

তারপর অর্জুন উত্তরকে বললেন, “তুমি ওই হিরন্ময় ধ্বজের স্বর্ণময় পতাকার নিকট রথ নিয়ে চল। ওখানে পিতামহ ভীষ্ম অপেক্ষায় আছেন।”

উত্তর বললেন, “আমি মুগ্ধ হয়েছি আপনাদের অস্ত্রচালনা দেখে। আমার মনে হচ্ছে দশ দিক যেন ঘুরছে। চবি, রক্ত আর মেদের গন্ধে আমার মূর্ছা আসছে। ভয়ে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার লাগাম ধরার শক্তি নেই।”

অর্জুন বললেন, “ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও এই যুদ্ধে অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছ। ধীর ভাবে ঘোড়া চালাও, ভীষ্মের নিকটে আমাকে নিয়ে চল। আজ তোমাকে নানারকম অস্ত্রশিক্ষা দেখাব।”

উত্তর ভরসা পেয়ে ভীষ্ম রক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম ও অর্জুন একে অন্যের প্রতি প্রাজাপত্য ঐন্দ্র আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন। অবশেষে ভীষ্ম বাণের আঘাতে অচেতন

প্রায় হলেন। তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর দুর্যোধন রথে আরোহণ করে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণবিদ্ধ হায় রক্ত বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, "কীর্তি ও বিপুল যশ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? তোমার দুর্যোধন নাম আজ মিথ্যা হল। তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালাচ্ছ।"

অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাক্য শুনে দুর্যোধন ফিরে এলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। এবং অর্জুনকে ঘিরে সবদিক থেকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। তখন অর্জুন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র ব্যবহার করলেন। কুরু-পক্ষের সকলে অচেতন হয়ে পড়ল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ করে অর্জুন বললেন, "উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের সাদা বস্ত্র, কর্ণের হলদে বস্ত্র, এবং অশ্বত্থমা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র খুলে নিয়ে এস। ভীষ্ম বোধ হয় চেতনা হারায় নি, কারণ তিনি আমার অস্ত্র প্রতিরোধের উপায় জানেন। তুমি তাঁর বাম দিক দিয়ে যাও।" দ্রোণ প্রভৃতির কাপড় নিয়ে এসে উত্তর পুনরায় রথে উঠলেন এবং অর্জুনকে নিয়ে

রণক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন।

অর্জুনকে যেতে দেখে ভীষ্ম তাঁকে বাণ মারলেন। দুর্যোধন চেতনা লাভ করে বললেন, "পিতামহ অর্জুনকে, অস্ত্রের আঘাত করুন, যেন ও চলে যেতে না পারে।"

ভীষ্ম হেসে বললেন, "তোমার বুদ্ধি আর বীরত্ব এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন ধর্নুবাণ ফেলে দিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে ছিলে তখন অর্জুন কোনও নিষ্ঠুর কাজ করেন নি। তিনি তিন লোকের রাজ্যের জন্যও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন না। তাই তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিহত হওনি। এখন তুমি নিজের দেশে
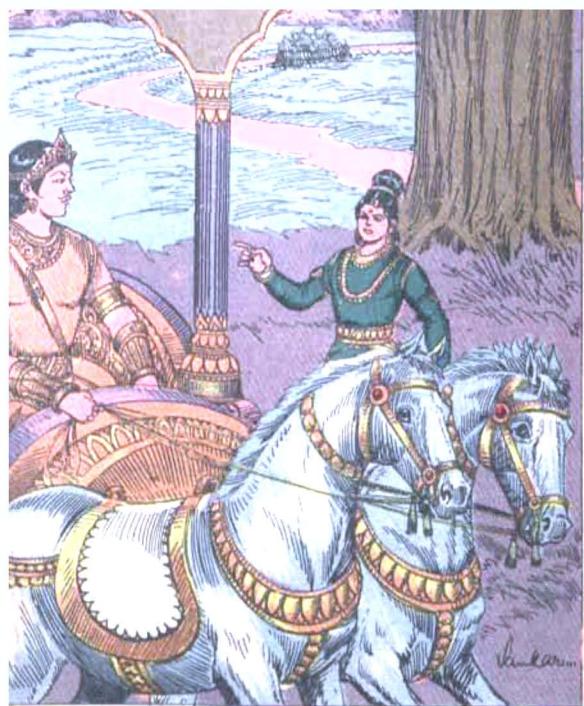
ফিরে যাও। অর্জুনও গরু নিয়ে যাক।"

দুর্যোধন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে চুপ করলেন। অন্যান্য সকলেই ভীষ্মের কথা মেনে দুর্যোধনকে নিয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

কুরুবীরগণ চলে যাচ্ছেন দেখে অর্জুন আনন্দিত হলেন। এবং গুরুজনদের মিষ্ট কথায় সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুসরণ করলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে নত মস্তকে প্রণাম জানালেন। অশ্বত্থামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে নানা বান দিয়ে অভিবাদন করলেন। বাণের আঘাতে দুর্যোধনের রত্নখচিত মুকুট ছেদন করিলেন। তার-পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, "রথের ঘোড়া ঘুরিয়ে নাও। গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন রাজধানীতে ফিরে চল।"

অর্জুন উত্তরকে বললেন, "বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার নিকট আমাদের পরিচয় দিও না। তাহলে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। তুমি নিজেই যুদ্ধ করে কৌরবদের পরাজিত করেছ এবং গোধন উদ্ধার করেছ—বলো।"

উত্তর বললেন, "আপনি যা করেছেন তা আর কেউ পারেনা। আমার তো সে শক্তি নেই-ই। তবুও আপনি অনুমতি না দিলে আমি আসল ঘটনা বলব না।"

অর্জুন বিক্ষত দেহে শ্মশানে শমী বৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর পতাকায় অবস্থিত মহাকপি ও ভূতগণ আকাশে চলে গেল। দেবী মায়াও অদৃশ্য হল। উত্তর রথের উপর পূর্বের মত সিংহ বসিয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি শমী বৃক্ষের রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অর্জুন বললেন, "রাজপুত্র, দেখ গোপালগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে ঘোড়াদের স্নান করিয়ে জল খাইয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে বিরাটনগরে যাব। তুমি কয়েকজন গোপকে বলে দাও তারা তাড়াতাড়ি নগরে গিয়ে তোমার

জয় ঘোষণা করুক।"

ওদিকে বিরাট রাজা আক্রমনকারীদের পরাজিত করে চারজন পাণ্ডবের সাথে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন হরণ করেছে। রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সাথে নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁর সেনাদলকে বললেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন কিনা। নপুংসক যার সারথি তার বাঁচা অসম্ভব মনে করি।"

যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, "মহারাজ, বৃহন্নলা যদি সারথি হয়, শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না। তার সাহায্যে রাজকুমার কৌরবগণকে এবং দেবাসুরদের জয় করতে পারবেন।"

এমন সময় উত্তরের দূতরা এসে বিজয় সংবাদ দিলেন। বিরাট আনন্দের উত্তেজনায় মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন, "রাজমার্গ পতাকা দিয়ে সাজাও। দেবতাদের পূজা দাও। কুমারগণ, যোদ্ধাগণ ও অলঙ্কারে সজ্জিতা গণিকাগণ বাজনাসহ আমার পুত্রের আগমন সংবাদ জানাও। হাতীর উপর ঘন্টা বাজিয়ে সমস্ত রাজপথে আমার জয় ঘোষণা করুক।
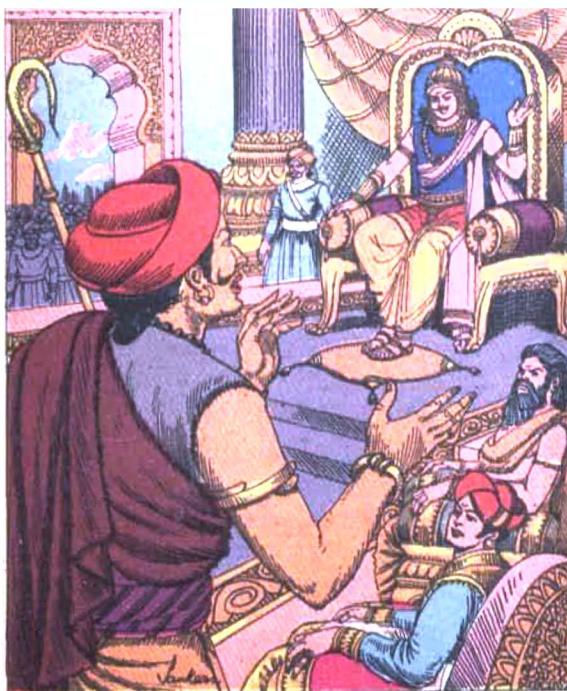
সজ্জিত বহু কুমারীর সাথে উত্তরা ও বৃহন্নলাকে আনতে যাক। তারপর বিরাট বললেন, "সৈরিন্ধ্রী, পাশা নিয়ে এস। কঙ্ক, খেলবে এস।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মহারাজ, শুনেছি অতি আনন্দ অবস্থায় পাশা খেলা উচিত নয়। এ খেলায় বহু দোষ, তা ত্যাগ করাই ভাল। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে থাকবেন, তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও পাশা খেলায় হারিয়ে ছিলেন। তবে আপনি যদি একান্তই ইচ্ছা করেন তবে খেলব।"

বিরাট বললেন, "দেখ, আমার পুত্র কৌরববীরগণকে পরাজিত করেছে।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "বৃহন্নলা যার সারথি সে জয়ী হবে না কেন?"

বিরাট রেগে গিয়ে বললেন, "নীচ ব্রাহ্মণ, তুমি আমার পুত্রের সমান মনে করে একটা নপুংসকের প্রশংসা করছ! আমার অপমান করছ! নপুংসক কি করে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার সমান বয়সি বন্ধু সেই জন্য অপরাধ ক্ষমা করলাম। যদি বাঁচতে চাও, এমন কথা বলো না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মহারাজ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ছাড়া আর কে যুদ্ধ করতে পারেন? ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না।"

বিরাট বললেন, "বহুবার নিষেধ করছি। তবুও তুমি সংযত ভাবে কথা বলছ না। শাসন না করলে কেউ ধর্ম-পথে চলে না।" এই বলে বিরাট খুব রেগে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তিনি হাত দিয়ে তা ধরে দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ সোনার পাত্র এনে ঐ পাত্রে রক্ত ধরলেন। এই সময়ে দ্বারপাল এসে সংবাদ দিল যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন। তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে দরজায় অপেক্ষা করছেন।

বিরাট বললেন, "তাদের নিয়ে এস।" অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন কারণে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করে তবে সে জীবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে যুধিষ্ঠির দ্বারপালকে বললেন, "উত্তরকে নিয়ে এস, বৃহন্নলাকে নয়।"

উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম করে দেখলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক পাশে মাটিতে বসে আছেন। তাঁর নাক রক্তাক্ত। দ্রৌপদী তাঁর কাছে রয়েছেন।

উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কে এই পাপ কাজ করেছে?"

বিরাট বললেন, "আমি এই খারাপ

লোকটাকে মেরেছি। একে আরও কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। কত বড় সাহস! আমি তোমার প্রশংসা করছি আর এই লোকটা ঐ নপুংসক বৃহন্নলার প্রশংসা করছে। মুখের ওপর কথা!"

"মহারাজ, আপনি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন। এঁকে এক্ষুনি শান্ত করুন। এঁর মন প্রসন্ন করুন। তা যদি না করেন তাহলে আপনাকে ব্রহ্মশাপে সবংশে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে।"

উত্তরের কথায় রাজা বিরাট যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

যুধিষ্ঠি বললেন,"রাজা, আমি অনেক আগেই আপনাকে ক্ষমা করেছি। আপনার উপর আমার কোন রাগ নেই। আমার রক্ত মাটিতে পড়লে আপনি বিনষ্ট হতেন, আপনার রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেত।"

যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত থামল। পর-ক্ষণেই অর্জুন এসে রাজা ও যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সামনেই রাজা বিরাট নিজের ছেলে উত্তরকে বললেন, "হে বৎস, তোমার মত যোগ্য পুত্র আর একটিও আমার নেই, হবেও না কোনদিন। তোমার বীরত্ব অতুলনীয়। কত বড় বড় বীরদের তুমি পরাজিত করেছ। মহাবীর কর্ণ এবং কালাগ্নির মত দুঃসহ ভীষ্মকে তুমি পরাজিত করেছ। ক্ষত্রিয়দের অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য এবং তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা তোমার কাছে হয়েছে পরাজিত। শুধু কি তাই, বীরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনও তোমার সাথে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না। এঁদের সবাইকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে গোধন উদ্ধার করেছ। কল্পনাতীত ঘটনা।"

"আমি গোধন উদ্ধার করি নি। শত্রুকে পরাজিতও করি নি। আমি পালিয়ে ফিরে আসছিলাম। এক দেবপুত্র আমাকে পালাতে দেননি। তিনিই রথে উঠে কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা কৃপাচার্য এবং দুর্যোধন—এঁদের সবাইকে পরাস্ত করে গোধন উদ্ধার করেছেন।" (চলবে)

শিবপুরাণ

চার
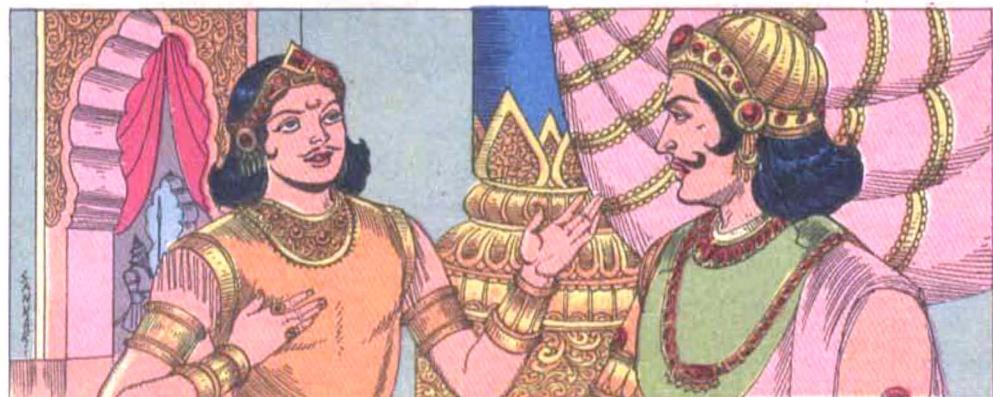
আদিকালে যখন রাক্ষস এবং দেবতার মধ্যে যুদ্ধ হত তখন দেবতারাই বেশী করে মারা যেত। সেইজন্য একবার সমস্ত দেবতা মেরু পর্বতে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাদের অমর করে দিতে প্রার্থনা করল।

"তোমরা দানবদের সাথে নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রে সমস্ত ঔষধ ঢেলে দেবে। আর মন্দর পর্বতকে মন্থন-দণ্ড রূপে ব্যবহার করে মন্থন করবে। সেই মন্থনের ফলে উঠে আসবে অমৃত। সেই অমৃত পান করে তোমরা অমর হবে।" বিষ্ণু তাদের বললেন।

দেবতারা মন্দর পর্বত উপড়াতে চেষ্টা করে আবার মেরু পর্বতে গিয়ে বিষ্ণুকে জানাল যে মন্দর পর্বত উপড়ানো তো দূরের কথা তারা কেউ নাড়াতেও পারেনি।

তারপর বিষ্ণুও আদিশেষকে ডেকে বললেন, "তুমি এই দেবতাদের সাথে গিয়ে মন্দর পর্বতকে উপড়ে তা ক্ষীর সমুদ্রে ফেলে দাও!" আদিশেষ বিষ্ণুর আদেশ মত কাজ করল।

মন্দর পর্বত ক্ষীর সমুদ্রে ডুবে গেল। সেই পর্বতকে কেউ তুলে না ধরলে মন্থন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আর মন্থন না করলে অমৃত উঠবে কি করে!

দেবতারা আবার বিষ্ণুকে প্রার্থনা করল। বিষ্ণু মহাকূর্ম রূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে নিজের পিঠে বহন করলেন। কিন্তু মন্থন করার জন্য যে দড়ি দরকার তা ওদের কাছে ছিল না। তখন বাসুকি রাজী হল নিজে দড়ি

হিসেবে ব্যবহৃত হতে। দেবতা ও দানব ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করল। দেবতারা বাসুকির মাথার দিকে ধরতে চাইল তখন দানবেরা বলল, "তা হলে কি আমরা বাসুকির লেজ ধরে থাকব ?" দানবেরা বাসুকির মাথার দিক ধরল, লেজের দিকে ধরতে দিল দেবতাদের।

সমুদ্র মন্থনের সময় বাসুকীর মুখ থেকে ধোঁয়া আর আগুনের হলকা বেরুতে লাগল। তার ফলে দানবরা ভীষণ কাহিল হতে লাগল। সেই উত্তাপ দেবতারাও কিছুটা পেয়েছিল কিন্তু তারা ততটা কাহিল হয়নি। দেবতাও দানবদের এই একত্র মন্থনের ফলে অমৃত বেরোয় নি, বেরুলো হলাহল। আর সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, তিনলোকে।

এ সব দেখে সবাই ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে তারা কৈলাশ পর্বতে ছুটে গেল। সেখানে পার্বতীসহ শিব বসে আছেন। দেবতারা বলল, "হে প্রভু, হলাহল তিনলোকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই হলাহলের বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সমস্ত লোকের দেবাদিদেব মহাদেব আপনি, আপনার অসীম ক্ষমতা।"

ওদের অবস্থা দেখে শিব পার্বতীকে বললেন, "দেখছ ? এদের মন্থনের ফলে কালকূট বেরুচ্ছে, যার ফলে তিন লোকে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এদের অভয় দান করা আমার কর্তব্য। এখন আমি এই হলাহল পান করব। এদের রক্ষা আমাকে করতেই হবে।" বললেন শিব। পার্বতী তাতে রাজী হলেন। তারপর শিব সমস্ত লোকে যে তীব্র বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল তা একত্র করে হাতের তালুতে নিয়ে মুখে ফেলে নিলেন। সেই হলাহল শিব কন্ঠে ধারণ করলেন। মহেশ্বরের মধ্যেও সেই তীব্র বিষের ক্রিয়া না হয়ে যায়নি। তাঁর কণ্ঠ কালচে-নীল হয়ে গেল। সেই থেকে শিবের নাম নীলকণ্ঠ হল।

শিবের কালকূট গিলে ফেলার পর

দেবতা ও দানবরা আবার ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করতে লাগল। এইবার তার থেকে কামধেনুর জন্ম হল। যজ্ঞকরার জন্য তাকে ঋষিরা নিয়ে নিল। তারপর উচ্চৈঃ-শ্রবা নামে এক বিরাট শ্বেত অশ্ব বেরুল, বলি সেটাকে কিনতে চাইল। ইন্দ্রও সেটাকে নেবার কথা ভাবল কিন্তু বিষ্ণু তাতে বাধা দিল।

তারপর ক্ষীর সমুদ্র থেকে ঐরাবত নামে চারটি দাঁতের এক শ্বেত হস্তীর জন্ম হল। সেই সমুদ্র থেকে পারিজাত ও অপ্সরার জন্ম হল। পরক্ষণে উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত করে লক্ষ্মী দেবীর জন্ম হল। লক্ষ্মী স্বয়ং বিষ্ণুর বক্ষস্থল গ্রহণ করে এলো। লক্ষ্মী দেবীর সাথে সাথে ক্ষীর সমুদ্রে চন্দ্রের জন্ম হল।

এদের সবার পরে ধন্বন্তরি অমৃত কলস নিয়ে বাইরে এলো। তৎক্ষণাৎ দানবরা সেই কলস কেড়ে নিয়ে পালাল। দূরে গিয়ে দানবরা নিজেদের মধ্যে ঐ কলস নিয়ে বিবাদ করতে লাগল। এই অবস্থায় দেবতারা আর্তনাদ করতে লাগল। বিষ্ণু দেবতাদের বুঝিয়ে বললেন, "তোমরা চিন্তা করো না। আমি যেকোন ভাবে ঐ অমৃত তোমাদের পাইয়ে দেব।"

পরক্ষণেই বিষ্ণু অত্যন্ত সুন্দরী মোহিনীর রূপ ধারণ করে দানবদের কাছে গেলেন। দানবরা ঐ মোহিনীর রূপ দেখে আর অটল থাকতে পারল না। প্রত্যেকে মোহিনীর কাছে গিয়ে বলল,
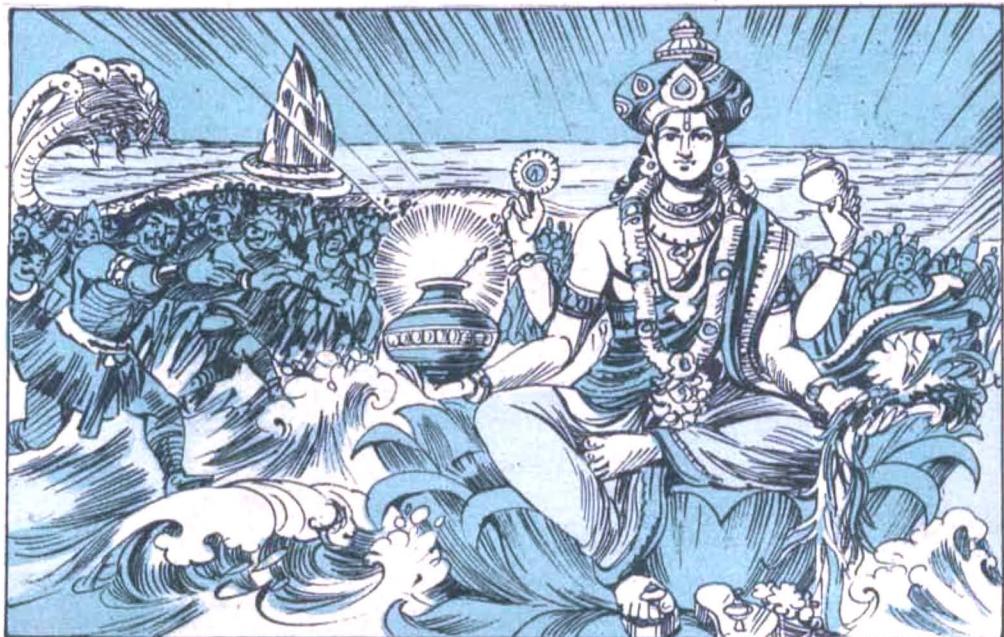
"আমরা এই অমৃত নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারছি না। ঝগড়া করছি। তুমি নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের মধ্যে এই অমৃত ভাগ করে দাও।"

"আমি যা করব তাতে তোমরা রাজী থাকলে তবেই আমি বন্টন করব।" মোহিনী বলল। দানবরা রাজী হল।

মোহিনী দানব ও দেবতাদের দুই পঙক্তিতে বসাল। দেবতাদের বসালো প্রথম পঙক্তিতে। ঐ অমৃত মোহিনী আগে দেবতাদের মধ্যে বন্টন করে সমস্ত অমৃত শেষ করে ফেলল। যেহেতু দানবরা মোহিনীর বন্টন ব্যবস্থা মেনে নেবার কথা দিয়েছিল। অতএব পরে আর এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে কোন কথা বলল না। দেবতাদের অমৃত পানের পর বিষ্ণু মোহিনী-রূপ সরিয়ে নিলেন।

শিব শুনলেন যে বিষ্ণু মোহিনী-রূপ ধারণ করে দানবদের ধোকা দিয়েছেন এবং দেবতাদের মধ্যেই সমস্ত অমৃত বন্টন করে ফেলেছেন। তখন পার্বতীকে সাথে নিয়ে ষাঁড়-বাহনে চড়ে বিষ্ণুর কাছে এসে শিব বললেন, "আমি তোমার সমস্ত অবতার দেখেছি কিন্তু তুমি নাকি মোহিনী-রূপ ধারণ করেছ? কোই তাত আমি দেখিনি। সেই মোহিনী-রূপ দেখার জন্যই এত দূর ছুটে এসেছি।"

"দানবদের মোহিত করার জন্য যে রূপ ধারণ করেছিলাম সেই মোহিনী-রূপ আপনাকে দেখাচ্ছি।" এই কথা বলে বিষ্ণু অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং পরক্ষণে মোহিনী-রূপ ধারণ করে খেলতে খেলতে দেখা দিলেন।

শিব সেই মোহিনীকে দেখে পার্বতী এবং অন্যদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। সবার চোখের সামনেই শিব সেই মোহিনীর পিছু নিলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল যে এসব বিষ্ণুর মায়া রূপ। তারপর বিষ্ণু শিবের আত্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রশংসা করলেন।

পরিশেষে শিব পার্বতীকে সাথে নিয়ে কৈলাশে ফিরে গেলেন। (চলবে)

অপূর্ব প্রপাত 'এঞ্জেল'

দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ভেনেজ্যুলার 'এঞ্জেল' প্রপাত বিশ্বের সমস্ত প্রপাতের চেয়ে উঁচু। এর উচ্চতা ৩২১২ ফুট অর্থাৎ আধ মাইলের অনেক বেশি। নায়গ্রা প্রপাত এর পনর ভাগ। এই প্রপাতের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল এই প্রপাতের জল পাহাড় থেকে সোজা প্রবাহিত হয়ে নিচে পড়ে না। পাহাড়ের ভাঁজে অন্তর্বাহিনীতে প্রবাহিত হয়ে সেই জল নিচে পড়ে। এই প্রপাতকে ভাল ভাবে দেখতে হলে বিমানে চড়ে দেখতে হয়।

ফটো : যাদব
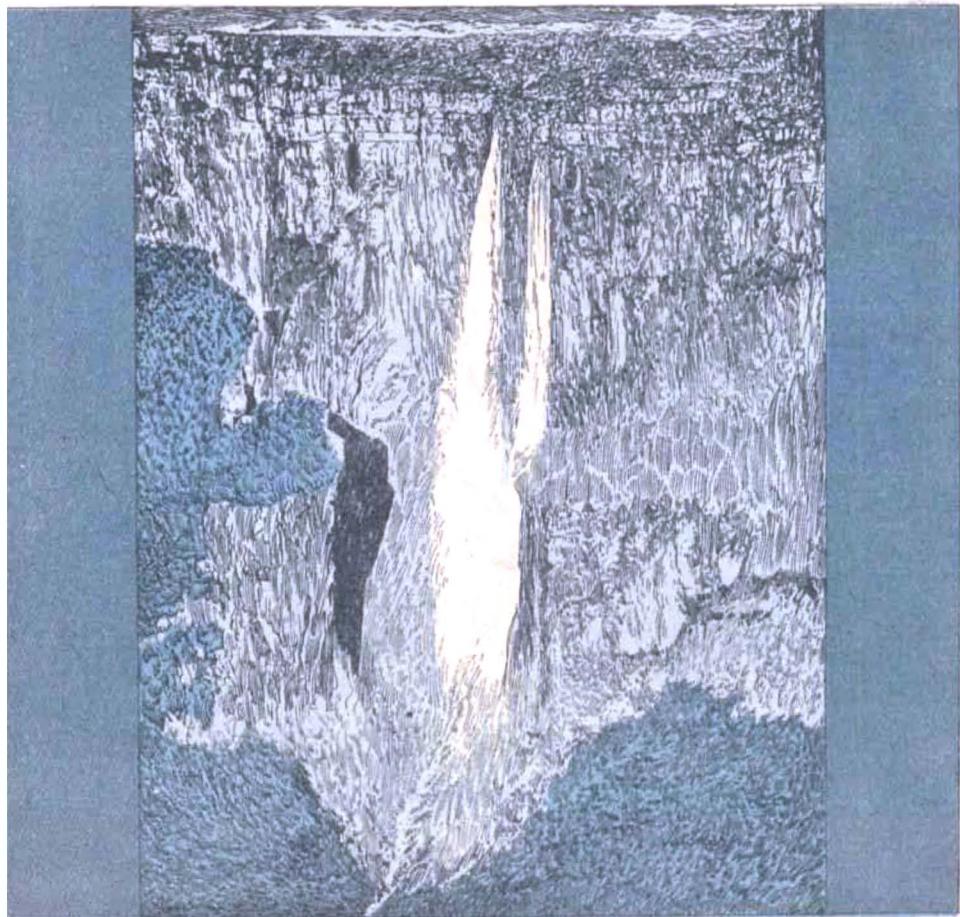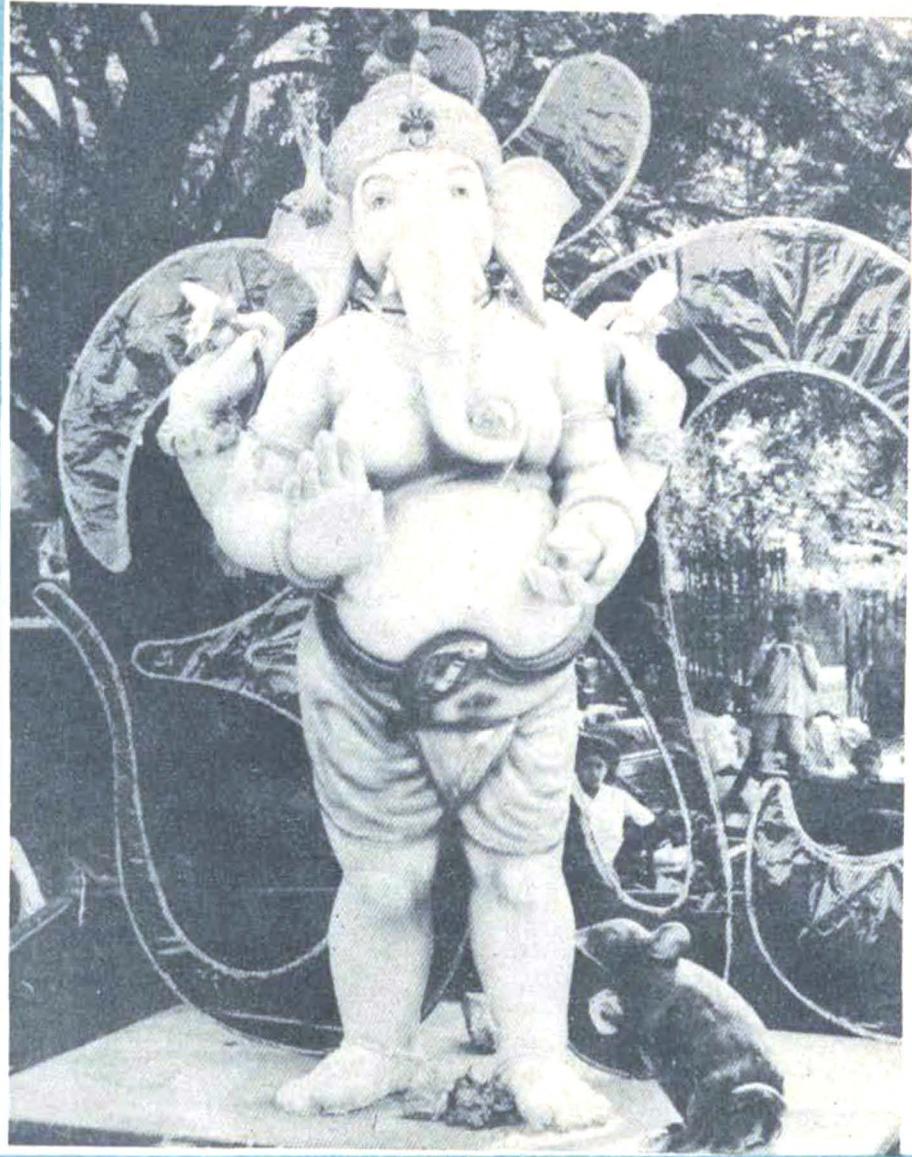
পুরস্কৃত
টীকা

নকল মাথা পায় পূজা

পুরস্কার পেলেন
রাজা স্বর্ণকার

ফটো : যাদ
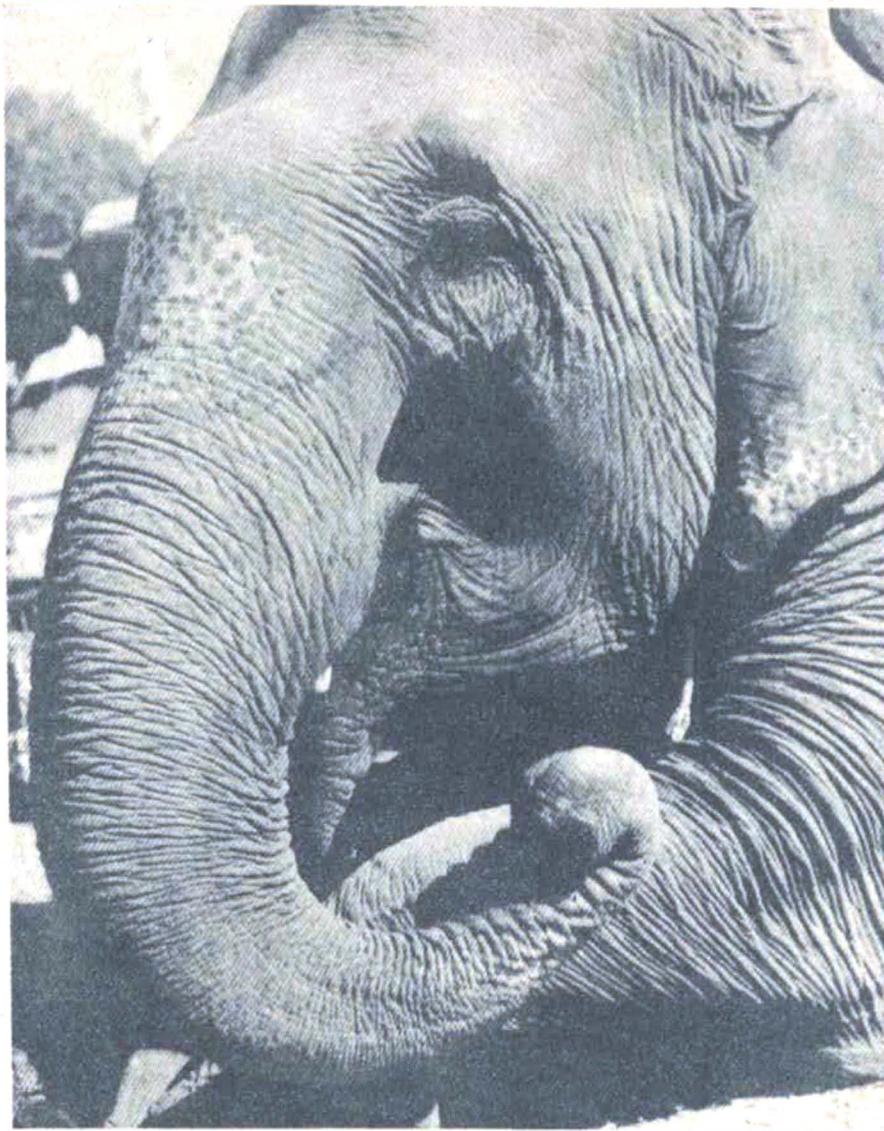
৪০ শাস্ত্রী রোড
নৈহাটী. ২৪ পরগণা

আসল মাথা বহে বোঝা

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

★ পরিচয়-টীকা বা নামকরণ ২০শে নভেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ পরিচয়-টীকা দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর টীকার মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয় টীকা সহ বড় ফটো জানুয়ারী '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
হলেবীড়ু দেবালয় (মহিশূর)

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
বৃন্দাবন গার্ডেন্স (মহিশূর)

ঘরে ঘরে সবার প্রিয়
লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চা
সত্যিকারের ভালো চা,
ঠিক আপনার মনের মতন
লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট—কড়া লিকার আর চমৎকার স্বাদগন্ধে আপনার মন না-ভরেই যায়না। লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট—খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়েও। বাড়িতে নিন। বন্ধু-বান্ধবদের খুশি করতেও এর জুড়ি নেই।
LIPTON'S
GOLDEN DUST TEA
LIPTON
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর
LHGC-12/72

Photo by P. M. VARAPRASADA RAO

শিবপুরাণ